চর আতরজান

আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন

"বাংলাদেশ লেখক ইউনিয়নের অনুরোধে বি সি. আই সি-এর খুলনা নিউজপ্রিণ্ট মিলে উৎপাদিত হ্রাসকৃত মূল্যের 'লেখক' কাগজে মুদ্রিত।"

মুক্তধারা ৯৩৩

প্রকাশক ঃ
চিত্তরঞ্জন সাহা
মুক্তধারা
[স্বঃ পুথিঘর লিঃ]
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা-১
বাংলাদেশ

প্রথম প্রকাশ ঃ জুন ১৯৮৫
প্রচ্ছদ-শিল্পী ঃ বীরেন সোম

মুদ্রাকর ঃ
প্রভাংশুরঞ্জন সাহা
ঢাকা প্রেস
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা-১
বাংলাদেশ

মূল্য ঃ সাদা ঃ ২২·০০ টাকা
লেখক কাগজ ঃ ১৬·০০ টাকা

CHAR ATARJAN
[A Novel]
By Abul Khair Muslehuddin
First Edition : June 1985
Cover Design : Biren Shome
Publisher : C. R. Saha
MUKTADHARA
[Prop. Puthighar Ltd.]
74 Farashganj
Dhaka-1
Bangladesh
Price : Whiteprint : Taka 22·00
Lekhakprint : Taka 16·00

লেখকের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

ছড়া ঃ

হরেক রকম, লাল টুকটুক, টাকডুমাডুম, রাজপুত্তুর, গুটুল মুটুল, কুরমুর ভাজা

ছোটদের গল্প-উপন্যাস ঃ

লাল গেঞ্জি, কোঁকড়া চুল, কড়ে আঙ্গুলের ছাপ, ম্যাক্‌গ্র সাহেবের ব্যাঘ্র শিকার, মস্তান বাবার আস্তানায়, নীলগিরির ডায়নোসর

জীবনী ঃ

হযরত সালমান ফারসী

গল্প ঃ

চিরকুট, নেপথ্য নাটক, ওম শান্তি, শালবনের রাজা, নল খাগড়ার সাপ, রম্য গল্প ১ম ও ২য় খণ্ড, চাবুক, ফুলবানুর হাঁস, নিষিদ্ধ শহর

উপন্যাস ঃ

বাতাসীর প্রেমকথা, দুঃস্বপ্নের জলপায়রা

কবিতা ঃ

নারিন্দা লেন

শীতের দুপুর। রোদটা এতক্ষণে বেশ ঝলমলে হয়ে উঠেছে। উঠোনের মাঝখানে একটা মোটা চাটাইয়ে কাঁথা পেতে শোয় গেদু মাতবর। পিঠ পেতে দেয় রোদের দিকে।

এক পেট খেয়েছে ঘন্টাখানেক লাগিয়ে। পুকুর থেকে তোলা তাজা কাতলা মাছের পেটি। তেলতেলে বড় মাছে দারুণ লোভ মাতবরের। একটা বড়সড় চারসেরি মাছের অর্ধেকটা একলাই খেয়ে ফেলতে পারে এক বৈঠকে। পুকুর ভর্তি মাছ। কিলবিল করে ওর নাতনাতনীদের মত।

ভর পেটে ঘুমটা নেমে আসে তড়িঘড়ি। চোখ জোড়া ঘোলা হয়ে ওঠে রোদের আমেজ পেয়ে।

'ওই তাইজ্যা। মরছস্ না জিন্দা আছস?' হাঁক ছাড়ে মাতবর, 'তামুক দিবিনা?'

'মরুম ক্যান? দিতাছি।' হুঁকোটায় জোরে জোরে টান দেয় তাইজ্যা। নাক মুখ ভরে ধুঁয়ো ছাড়ে। হাত বাড়িয়ে এগিয়ে দেয়, 'লন, খান।'

মনে মনে আওড়ায়, 'দুইটা টান দিয়াই খুকুর-খুকুর কাশি। বুকের ভিতরটা তো চালনির লাহান ঝাঁঝরা। মরবেন তো আপনে। আজরাইল খাড়াইয়া রইছে না উঠানের মাথায়? আমি মরুম ক্যান? আমার ক্ষয়কাশি হইছে নাকি যে রক্ত বমি কইরা মইরা শেষ হইয়া যামু?'

বিড়বিড় করে বলে তাইজ্যা। কি বলে, স্পষ্ট হয় না।

'কি কস রে হারাম্—' গালিটা শেষ করবার আগেই কাশি ওঠে মাতবরের। খুক খুক করে ধোঁয়া ছাড়তে থাকে নাকে মুখে।

'ওই তাইজ্যা, গেলি কই? পানি আন দেখি। ঠাণ্ডা পানি খামু।'

উঠোনের পেছনে পগার। সেদিকে এগিয়ে গেছে তাইজ্যা। বালতি ভরে ঈষৎ গরম ফ্যান নিয়ে গেছে দুধাল গাইটার জন্য। শুনতে পায়নি বুড়োর হাঁকাহাঁকি।

কুরকুরু মামুদের পুত্র বেঙ্গা মামুদ। বেঙ্গার পুত্র ইসব মামুদ। ইসবের পত্র গেদু মামুদ।

কোম্পানির আমলেই সরকারি রেকর্ডপত্রে বসতবাটি আর মাঠের জমি মিলিয়ে দেড় শ' কানি সম্পত্তি ছিল কুরকুরু মামুদের। তারপর থেকে সেটা বাড়তে বাড়তে এখন দু'শ দশ কানিতে পেঁীছেছে। জোত জমার রাশি খুব ভাল এ পরিবারের। নিলাম ডেকে বাড়াও, নায়েব তহশীলদারদের সঙ্গে আওভাও করে খাসের জমি লিখিয়ে নাও, বড় খাসী ছাগল আর চিকণ চাল ভেট দিয়ে নকল দলিল বের করে আনো সাবরেজিস্ট্রারের অফিস থেকে। বংশপরম্পরায় সব কায়দা কানুন জানে গেদু মামুদ।

জানতে হয় বলেই জানে। মক্তবে যাওয়া থেকেই তো খাজনার দাখিলা, পর্চা, খতিয়ান, দলিল দস্তাবেজ সব হাতড়াচ্ছে। হাতে কলমে মামলা মকদ্দমা শিখেছে বাপের সঙ্গে কোর্ট কাচারি গিয়ে। উকিলের জেরা শুনেছে এজলাসের কোণে হাঁটু গেড়ে বসে। না জেনে না শিখে উপায় কি? বাপ দাদা পর-দাদার এত সব বিষয় আষয় রক্ষা করতে হলে মামলা মকদ্দমা উকিল মোক্তারের প্যাঁচ প্যোঁচ শিখতে হবে না?

লাল গাইটাকে খাইয়ে যখন ফিরে আসে তাইজ্যা, মাতবর তখন গাঢ় ঘুমে অচেতন! মুখটা হা করা শামুকের খোলের মত। একটা ডাঁশমাছি সুড়সুড়ি দিচ্ছে বুড়োর নাকের ছিদ্রপথে। ফলে নাকটা ঘুমের মধ্যেই কুচকে তুলছে মাতবর।

দেখে হাসি পায় তাইজ্যার। হা দিয়ে ওটা যদি ঢুকে যায় পেটের ভেতর? কাঁচা পায়খানায় ভনভন করা ডাঁশ মাছি। পেটে গেলে নাকি ওলাউঠা হয়।

তাড়াবে নাকি তাইজ্যা আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে?

হাত থেকে ফেনের বালতিটা নামিয়ে রাখে বুড়োর মাথার কাছে। আস্তে আস্তে এগোয় মাছিটার দিকে।

খৈল কুড়ার গন্ধ পেয়েছে ডাঁশমাছি। বুড়োকে ছেড়ে উড়ে এসে বালতির গায়ে বসে।

ওটার স্থান পরিবর্তন দেখেনি তাইজ্যা। বিরক্ত হয় ধরতে না পেরে। মুখে বলে, 'ধ্যেৎ, হালার মাছি গুয়ের থুপে গিয়া বইছে টাট্টিখানায়।'

'ও মাতবর নানা, ওঠেন, আর কত ঘুমাইবেন? বিকাল হইয়া গেছে না?'

নাকি সুরে আবদারের মত করে বলে যায়। উঠোনের মাথায় গোলাঘরের কোণে দাঁড়িয়ে একটা মেয়ে। পরনে ছেঁড়া মলিন ঘাগরা. গায়ে বোতামহীন নিমা, মাথাভর্তি চুলের জটা।

হাতের ওড়টা মেলে ধরে আছে মেয়েটা। নাকে সর্দি গলছে, ঠোঁট পার হয়ে মুখে ঢুকছে যেন। জিব দিয়ে চেটে দেখে শ্লেষা। আবার বলে আরেকটু জোরে, 'মাতবর নানা, আমাগোরে আধ মণ ধান দিবেন? বাড়িতে খোরাকি নাই। নানীর জ্বর, কামে যাইতে পারে না আইজ তিন দিন।'

চোখ মেলে তাকায় গেদু মামুদ। ঘুমের সুর কেটে যায় মেয়েটার উৎপাতে। কাঁথাটা পায়ের দিকে ঠেলে রেখে উঠে বসে। হাঁটুর ওপর উঠে গেছে লুঙ্গির প্রান্ত। সেদিকে লক্ষ্য নেই। হাই তোলে সশব্দে।

'ওই কি চাস? কেডা ঐখানে? কেডা তুই?'

'আমি তাহির পুরের গণি মিয়ার ঝি আত্তি। আধমণ ধানের লাইগা আইছি। নানী কইছে, জ্বর ভাল হইলে ঠিকা কাম কইরা শোধ দিবো।

খেকিয়ে ওঠে মাতবর, 'ধান দেন নানাজান, চাইল দেন চাচাজান। ধানের গোলাঘর খুলছি নাকি তোর লাইগা?' দুপুর না গড়াতেই ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ায় মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে ওঠে।

গোলাঘর থেকে কাঁচা ধানের গন্ধ আসছে। ডোল কে ডোল ধান উঠাচ্ছে বদলা মুনিরা। নতুন আমন ধান। এবারের ফসল ভাল। বৃষ্টি বেশীও হয়নি আবার কমও হয়নি। ঠিক ঠিক পানি পেয়ে মোটা মোটা থোড় বের হয়েছে ধান গাছের আগায়। কামলাদের ভাষায় কলার থোড়ের মত এক একটা শিষ, যেমন ওজন তেমন খুশব নতুন ধানে।

গেদু মামুদের ধমকে ভয় পায়না মেয়েটা। গলার নীচে ময়লার গাদ ঘসতে ঘসতে বলে যায়, 'নানীয়ে কইছে, যা তোর মাতবর নানার থন আধ মণ ধান নিয়া আয়। কয় দিন পর শোধ দিয়া দিমু।'

মাতবরের মেঝো ঘরের বড় মেয়ে রহিমা। ধান চাইতে আসা মেয়েটার সমবয়সী। বাপের পায়ের কাছ থেকে কাঁথাটা গুটাতে এসে দেখতে পায় ওকে।

'আধ মনে যদি তিরিশ সের দেস, তয় পাইবি।' স্পষ্টভাবে বলে মাতবর, 'কমটম হইবো না।'

'আচ্ছা দিমু নানা।' বলেই ওড়াটা এগিয়ে ধরে মেয়েটা, 'নানী আর আমি বাড়ি বাড়ি বারা দিয়া ধান পামু। তখন শোধ দিয়া দিমু।'

'রমু মা। মুনিগোরে কওতো আধ মণ ধান দিতে মাইয়াটারে। খাতায় হিসাব লেইখা রাখবো।'

'আচ্ছা', গোলাঘরের দিকে এগোয় রহিমা, 'এই বচ্ছর যত ধান হইছে তোমার, এখনই বেচন লাগবো বাজান।'

'এখন বেচুম ক্যান রমু। এখন তো ধানের মণ একশ' দশ পনর। আর ভাদ্র মাসে পুরা বারিষা শুরু হইলে দুই শ' পার হইয়া যাইবো না?'

'তয় এত ধান রাখবো কই? গোলা দুইটা তো ভইরা গেছে এখনই। তাইজ্যা যে কইলো, বাথানে এখনো তিন গোলার ধান।'

পান সুপারি খয়েরে গিল্টি করা দাঁত বের করে হাসে মাতবর, 'এই বার আরো দুইটা গোলাঘর বানামু রমু মা। বারিষ কাল ধইরা রাইখা দাদন করলে ডবল লাভ।'

পিতা ও কন্যার কথোপকথন শুনেছে এতক্ষণ মেয়েটা। এবার ওড়া হাতে এগিয়ে যায় গোলাঘরের দিকে। ওকে না চিনলেও ওর বাপ গণিকে চিনতো মাতবর। আর বছর বর্ষাকালে মাতবরের শনখোলায় শন কাটতে গিয়ে সাপের দংশনে মরেছে জোয়ান মর্দটা। কামলা খাটতো এ বাড়িতে ছোট কাল থেকে।

'নানা আইজ আপনেগো বাড়ীতে জোয়াফত নি?' চোখ দুটো চকচক করে ওঠে মেয়েটার। রান্নাঘরে মাছ ভাজা হচ্ছে। ভুনা গোসতের গন্ধ আসছে। জিভে পানি ঝরানো গন্ধ। মক্তব থেকে, স্কুল থেকে ফিরে আসছে মাতবরের ছেলে-মেয়েরা নাতি-নাতনীরা। ওদের জন্য গরম ভাত, মাছ মাংসের সালুন রাঁধছে কাজের বেটিরা।

নতুন করে তামাক সেজে আনে তাইজ্যা। কল্কি উসকে দেয় দম দিয়ে।

মেয়েটাকে আপাদমস্তক দেখে। আগে কখনো দেখেনি। অনেক বেটাবেটি ছোঁড়াছুঁড়ি মাতবর বাড়ি আসে ভিক্ষা করতে। লেংড়া লুলা, আন্ধা, কানা—ফকিরের শেষ নেই দেশে। সপ্তাহে একবার দু'বার পালা করে ঢুঁ মারে মাতবর বাড়ি। অত বড় গেরস্ত দশ গ্রামে নেই আর। বাসি ভাত না হোক, মুঠ চাল কি খুদ মেলে যায় কতক্ষণ কান্নাকাটি করলে। মাতবর মাঝে মাঝে দিলদরাজ হাতেমতাই বনে যায়। জাকাত ফেতরা দেয় দু'হাতে। মরা বাপ দাদার রুহের মুক্তির জন্য গরু সিন্নি দিয়ে খতম পড়ায়।

'ওই মাইয়া, বাড়ি কই?' মেয়েটাকে চেনেনা তাইজ্যা। এ বাড়িতে এই প্রথম। ফকির বলে ভুল করে।

'বাড়ি তাইরপুর।'

'কেডা আছে বাড়িতে? জানি তো কইবি বাপ মা নাই।'

'নাই ই তো। নানী আছে। কানা নানী। চক্ষে দেখে না ভালা কইরা। তয় আমি কাম কইরা খাওয়াই। জ্বর আইজ কয়দিন, চাটাইতে পইড়া আছে।'

পটর পটর কথা বলে মেয়েটা। ওর দিকে ফিরে বসে গেদু মাতবর। বলে, 'কি কাম কাজ পারস?'

'হগল কামই পারি।'

'ভাত সালুন রাঁধতে?'

'একটু একটু পারি। নানীতো তেমন চক্ষে দেখেনা। আমিতো রান্ধি হাইঞ্জা বেলা ঠিকা কাম সাইরা বাড়ি ফিরা গিয়া।'

'উঠান ঝাড়তে পারস? ধান শুকাইতে? ঢেঁকিতে পাড় দিতে?' যোগ দেয় তাইজ্যা।

'পারি।'

'নানা।' গেদু মামুদকে পরামর্শ দেয় তাইজ্যা, 'খোন্দের কততো কাম। রাইখা দেই মাইয়াটারে। ফুটফরমাশ খাটবো।'

'ওই থাকবি? তিন বেলা খাওন পাইবি।'

ঘাড় কাত করে সম্মতি জানায় মেয়েটা। উকুনভর্তি মাথায় চুলের জটা চুলকায় দুহাতে, 'নানীয়ে কইলে থাকুম।'

'নাম কি তোর?' কাঁধে গামছা তুলে উঠে দাঁড়ায় মাতবর।

'আতরজান। নানী ডাকে আত্তি।'

'আতরজান!' হেসে ওঠে তাইজ্যা, 'গায়ে তোর গোবর আর চনার গন্ধ। কেডা নাম রাখছে তোর আতরজান বিবি? সইরা খাড়া। তোর শরীলে পচা মাছের পচা গন্ধ।'

সরে দাঁড়ায় না। বরং সামনের দিকে এগিয়ে আসে আতরজান। রান্নাঘরের চালার ফাঁক দিয়ে ধোঁয়া উঠছে। গরম ভাতের ধোঁয়াটা টানে যেন ওকে।

হলদে পাখির মত লেজ দুলিয়ে ঘরের দিকে নড়াচড়া করছিলো রহিমা। বাপের জন্য কাঁসার পানদানে করে পান নিয়ে আসে। জর্দা কিমামের কৌটো খুলে খিলি বানায় বাপের পাশে চাটাইয়ে বসে।

'বাজান।'

'কি?'

'হাটে যাইবা না আইজ?'

'যামু তো। বাতাসা চাই?'

'না।'

'তয়? আঙ্গুর ভাজা?

'না বাজান, আমার লাইগা এক শিশি রক্তজবা মার্কা আলতা আইনো বাজান।'

'আচ্ছা।' শরিফার দানার মত কালো দাঁত বের করে হাসে গেদু মামুদ। মেয়ের সেজে দেওয়া খিলি মুখে পুরে দেয়।

'আলতা বানাইবা? আমি বানাইবার পারি। খুব সোন্দর রং।' বলে আতরজান। বাপ বেটির কথোপকথন শুনতে পেয়েছে।

ঢেঁকিঘরের সামনে মাচান ভর্তি পুঁই লতা। শীতে পাতা কমে যায়। পাকা পাকা লালকালো দানা ডগায় ডগায়।

দৌড়ে গিয়ে দেখায় আতরজান, 'একটা খোরা আনো, চিইপা চিইপা এক খোরা রস বাইর কইরা দিমু তোমারে। পা ধুইয়া লাগাইবা। দেখবা কি সুন্দর দেখাইবো।'

'ওই ফইকরা মাইয়া। অত পটর পটর করস ক্যান? পুঁইয়ের কস দিয়া বুঝি বড়লোকের আলতা হয়? ভাগ্।' ঘরের চালে বসা পালা কবুতরের ঝাঁক। সেদিকে চেয়ে আপন মনে বলে তাইজ্যা, 'ফেনের

বালতিটা ধুইয়া আনি ঘাটা থন। সময় নাই। মাঠে যামু ঘাস আনতে। ফিরা আইসা হাটে যামু।'

মাথায় সাদা কিস্তি টুপি, গায়ে লম্বা ডোরাদার কোর্তা, পায়ে ধুলো বালিতে মলিন পাম্প সু। হাটে যাচ্ছে গেদু মাতব্বর।

পেছন পেছন কোরা হাতে তাইজ্যা। সদাই তো আর অল্প সল্প নয়। হাটের সেরা জিনিস কেনে গেদু। গরুর গোশতই তো লাগে দশ বারো সের। পরিবারে ছেলেমেয়ে নাতিনাতনী মিলে সব সময় জনা ত্রিশেক তো লেগে আছে। এক বেলাতেই আধ মন এক মন চাল লেগে যায়। বিবাহিতা কন্যারা বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে বাপের বাড়ি বেড়াতে এলে তিন মাসেও ফিরে যাবার নাম করেনা।

কামলা মুনিদের জন্য আলাদা রান্না হয়। মোটা চালের ভাত, সঙ্গে মিষ্টি কুমড়ার সুরুয়া কি পাতলা মাশকলাইর ডাল। মাঝে মধ্যে আতপ চালের খুদ, নারিকেলের দুধ আর আখাই গুড়ের মিশ্রণে তৈরি শিরনী দেওয়া হয় বদলাদের। বিশেষ করে খোন্দের প্রথম আর শেষ দিন। হাপুস হুপুস করে পেট ভরে খেয়ে ঢেকুর তোলে চাকরকুল।

'তাজু।' হাটের মুখে বলে মাতবর। বেশ জমে সাপ্তাহিক হাট প্রতি সোমবার। দুপুর থেকেই জমজমাট, আতরজান মাইয়াটার লাইগা একখান সাত হাতি শাড়ি কিনুম। মনে কইরা দিস। রামদাস যোগীর দোকান থন পছন্দ কইরা লইস।'

শাড়ি ক্যান নানা? রমু বু'জানের লাইগা আলতা?'

'শাড়িও কিনুম, আলতাও কিনুম। এতিম মাইয়াটার আধা লেংটা হাল। দেইখা আমারই শরম লাগতে আছিলো। কামে আইবো কইছে কাইল থন।'

'হ। মরিয়মের একখানা পুরান শাড়ি কি যোবেদার একটা ছেঁড়া ঘাগরা দিলেই তো হইবো। নতুন দেওনের কি দরকার?'

যোবেদা মেজো বিবির বড় মেয়ে। মরিয়ম বড় মেয়ের ঘরের নাতনী। স্বামীর বাড়ি যায় না মরিয়মের মা। পুরুষটা নাকি আস্ত গোঁয়ার, কারণে অকারণে মারধোর করে। বছর পাঁচ ধরে বাপের বাড়ি থাকছে মেয়ে। এক গণ্ডা সন্তান সমেত।

দুই

'ওই তাইজ্যা, বড় নানী বোলাইতে আছে।'

পুকুর ঘাটে দাঁড়িয়ে হাঁক ছাড়ে আতরজান।

'কি কইলি? তাইজ্যা? আমার নাম তাইজ্যা কেডা কইলো তোরে।' পুকুরে নেমে পানিতে ভেজানো ধান পরীক্ষা করছিল তাইজ্যা, ওতে অঙ্কুর এসেছে কিনা। অঙ্কুর গজালে বুঝতে হবে, ধান সেদ্ধ করার উপযুক্ত হয়েছে।

'তাইজ্যা না তো কি?' ঘাড় বাঁকিয়ে হাসে আতরজান।

'তাজুল ইসলাম মিয়া। ডাকবি তাজুভাই।' কোমর সোজা করে দাঁড়ায় তাইজ্যা পানিতে, 'তাইজ্যা টাইজ্যা কইবি তো থাপড়াইয়া চাপা ফাটাইয়া দিমু। বুঝলি আত্তি।'

'তা হইলে তুমিও আমারে আত্তি ডাকবানা। আতরজান ডাকবা। আতু ডাকবা।'

'বিবি আতরজান রে আমার।' ভেংচির মত করে বলে তাইজ্যা, 'তোরে আত্তি না ডাইকা হাত্তি ডাকুম। আইছিলি তো হাড্ডি ক' খান লইয়া, এখন খাইয়া খাইয়া হাতির মত তাজা হইছস। কবে আবার ফাইটা যাবি পটকা মাছের লাহান।'

একটা একটা করে সবগুলো কোরার ধান পরীক্ষা করে তাইজ্যা। সাত আট দিন ধরে পনিতে ভেজানো। সাদা মূল রেরিয়েছে ধানে। কামলা ডেকে উঠাতে হবে। বড় বড় লোহার কড়াইয়ে করে সেদ্ধ দেবে বউ ঝিরা, কাজের মেয়েলোকেরা। ঝকমারি কি কম? সেদ্ধ হলে উঠোনে শুকনো হবে দু' তিন দিন ধরে। শীতের রোদ, তেজ নেই তেমন। পা দিয়ে নেড়ে নেড়ে উল্টে পাল্টে দেওয়া হবে দিন ভর। ভাল করে শুকোলে ঝেড়ে চিটা আর হুং ছাড়িয়ে গোলায় তোলা হবে ডোল কে ডোল ভর্তি সেদ্ধ ধান। সেটাই পরিবারের সারা ছয়মাসের—আরেক খন্দ পর্যন্ত খোরাক।

হাটে বিক্রির ধান সেদ্ধ করার ঝক্কি নেই। বাথানে শুকিয়ে বাড়ি নিয়ে আসো আর মেপে মেপে গোলায় তোলো। সেদ্ধ দিয়ে চাল্ল করে বিক্রয় করলে দাম বেশী। কিন্তু অতো মুন মজুর আর কাজের বেটি পাবে কোথায়? ঘরের মানুষগুলো তো মাঝ রাত তক খেটেও সামাল দিতে পারে না।

'পাইছি রে পাইছি। আরে বাপ রে বাপ, কততো বড় রে।'

উল্লাসে চিৎকার করে ওঠে তাইজ্যা।

'কি পাইছে? দেখি দেখি?'

ঘরের দিকে যাচ্ছিল আতরজান। ফিরে দাঁড়ায়।

দু হাতে চেপে ধরে শূন্যে তোলে তাইজ্যা একটা ইয়া বড় ইচা মাছ। ভেজানো ধানের কোরার ভেতর ডিম পাড়তে এসেছিলো মাছটা। বুকের নীচে এক গাদা ডিম। কালো খোলস। লম্বা লম্বা কালো পা।

'দেখছস কততো বড় ইচা? দুই তিন বছরের পুরান মাছ। টিমটিমা আণ্ডা পেটে।'

'হ, ইস্ ঠ্যাংগুলা কততো লম্বা রে আল্লা। কেমনে ধরলা তাজুভাই?'

উৎসাহে তাইজ্যাকে তাজুভাই বলে ফেলে আতরজান। কাঁচা ঘাটের দিকে নেমে আসে পা ছেঁচড়ে।

'কেমনে ধরলাম? হাত দিয়া চাইপা ধরলাম ঠাইসা। নড়বার আগেই। লইয়া যা ঘরে। বড় নানীরে কইস, নারিকেল পিস্যা দুধ দিয়া কোর্মা রাঁইধা দিতো নানারে। দুপুরে কাচারির নায়েবসাব আইবো। হেরে লইয়া খাইবো। দাওয়াত দিছে নানায়।'

'দেও।'

হাত বাড়িয়ে জাপটে ধরে আতরজান। শূন্যে টিংটিঙে পা ছুঁড়তে থাকে গলদা চিংড়ি।

কাচারি ঘরে সাদা ধবধবে ফরাশের ওপর দস্তরখান পেতে খাওয়া লাগায় তাইজ্যা। পোলাও কোর্মা আর চিতল মাছের তেলাল পেটির খোশবুতে বাতাস মৌ মৌ করে। নিজ হাতে পরিবেশন করে খাওয়ায় গেদু মামুদ।

'আর একটা রান দেই নায়েব সা'ব? আমার ঘরের মোরগখাসী দুই বছর ধইরা পাইলা বড় করছি।'

বলে মোরগের একটা বিরাট টুকরা নায়েবের পাতে তুলে দেয় মাতবর।

পুকুরে পলো নিয়ে নেমেছিলো কামলারা। একটা দশ সের ওজনের চিতল ধরেছে খেপ মেরে। শুরুয়া সমেত মাছের দু'তিনটা পেটি ঢেলে দেয় গেদু নায়েবের বাসনে।

'খুব ভাল রান্না, মাতবর সাব।' খেতে খেতে কথা বলে নায়েব, 'এ এলাকায় আসলেই আপনার কথা মনে হয়। দারুণ মেহমানদারী আপনার।'

'আমার আর তেমন কি সাধ্য আছে সা'ব আপনাগো মত গণ্যমান্য মনিষ্যির খেদমত করার। দুই পয়সার গেরস্ত। আছিলো আমার বাপ দাদা। ধানের পাহাড় জমতো হেগো। রোজ জেয়াফত, রোজ কত মেহমানদারী। কুরকুরু মামুদের—।'

বলতে বলতে গলদা চিংড়িটা সম্পূর্ণ তুলে দেয় নায়েবের প্লেটে। পেয়াজ কুচি সমেত।

'খান সা'ব। আমাগো তাজু মিয়া ধরছে আপনার লাইগা ডুবাইয়া ডুবাইয়া। সারা দুপুর ডুবাইছে পুকুরে।'

মাথা নাড়ে তাইজ্যা। চিলুমচি আর বদনা হাতে দাঁড়িয়ে। খাওয়ার পর্ব শেষ হলে হাত ধোয়াবে নায়েবের।

বোঝে তাইজ্যা, মাতবর মিথ্যা কথা বলছে নায়েবকে খুশী করার জন্য। ও ব্যাটা প্রসন্ন হলে খাসের দীঘিটা—চাড়ালের দীঘিটা রহিমার মায়ের নামে লিখিয়ে নিতে পারবে।

পুরো বাটি দুধের ক্ষীর খেয়ে সাবাড় করে নায়েব। তৃপ্তির শব্দ করে বলে, 'কি সুগন্ধ দুধের। ঘরের গাই নিশ্চয়ই। ভাবছি, একটা দুধাল গাই কিনবো। নাতিনটা বাজারের দুধ একদম খেতে পারে না। পচা দুধ খেয়ে বারো মাস পেটের অসুখ।'

ইঙ্গিতটা বুঝতে পারে গেদু মামুদ। আপাদমস্তক দেখে নায়েবকে।

'ওই তাজু, পানের বরতন থুইয়া যা তো।'

'কই যামু?'

'গাইটা লইয়া আয় গোয়ালঘর থন। সাবে দেখবো।'

কারণটা ধরতে পারে না তাইজ্যা। ভাবে, খাঁটি দুধ খেয়ে গাইটা দেখার সখ হয়েছে নায়েব সাহেবের।

শুয়ে শুয়ে বিচালি চিবোচ্ছিলো গাই। পাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে বাছুর। বকনা বাছুর। ওলানে দুধ জমছে গাভীর। বিকেলে বালতি ভরে দোয়াবে তাইজ্যা। আসল গোয়ালার মত বাঁট টানতে পারে। ওর কায়দামত টানে দুধ নামে গাইয়ের। দু'জনে বন্ধুত্বও খুব। তাইজ্যাকে দেখলে সটান শোয়া থেকে উঠে দাঁড়ায়। গলা বাড়িয়ে দিয়ে চোখ বুজে থাকে, ওর হাতে আদর পাওয়ার আশায়।

'সুন্দর লক্ষ্মী গরু দেখি মাতবর সা'ব।'

'জ্বী। খুব শান্ত। লাথি গুতা দেয়না কখনো।'

'দুধ কয় সের পান রোজ?'

'ঠিক নাই সা'ব। ভোরে ছয় সাত সের, বিকালে সের চারেক।'

গাভীর পিঠে আদরের হাত বুলোয় নায়েব।

'কাইল পাঠাইয়া দিমু মানুষ দিয়া। বেলা দশটার মধ্যে পেঁৗছা যাইবো।'

প্রসন্ন দৃষ্টিতে মাথা নাড়ে নায়েব। পানদান থেকে একটা বড় খিলি তুলে নেয় মুখেরটা শেষ হবার পূর্বেই।

'আপনি আসবেন আগামী সোমবার। চাড়ালের দীঘিটার কাগজপত্র সব দেখে রাখবো।'

খুশী হয় গেদু মাতবর, 'রবিবার রাইতে আসুম সা'ব আপনার বাসায়। ছয়—নিয়া আসুম। কি কন?'

'ঠিক আছে। তাতেই হবে। বুঝেন তো খাসমহলের দীঘি। উপরের দিকেওতো দিতেটিতে হবে।'

'মাইয়া মানষের মত ফ্যাচর ফ্যাচর কইরা কান্দতে আছো ক্যান তাজু ভাই?' তাইজ্যার ফোঁপানি দেখে হাসি পায় আতরজানের। খিলখিল করে ওঠে।

হাতের তালু দিয়ে চোখ ঘসায় তাইজ্যা, 'কান্দুম না কেন? নায়েব বেটা লইয়া গেছে না আমাগো ধলা গাই? আমার ধলা গাই। আমি পালছিনা এত কাল? বাড়ির নামায় দড়ি ধইরা চরাইছিনা, ঘাস কাইটা আনছিনা বিলের থন?'

'একটা গাই গেছে, আরেকটা গাই কিনা আনবো নানায়। হের কততো টেকা। আরো বড় দেইখা আধ মণ দুধওয়ালা একটা কালা গাই কিনা আনবো। আমাগো তহিরপুরের মিরধা গো একটা কালা গাই আছে। বিহানে বারো সের দুধ বিকালে দশ সের। ফেন খাওয়ায়না হেরা। ফেন গরীবরে দেয় আর গাইরে ভাত খাওয়ায়। সাজি ভইরা গরম ভাত।'

শান্ত হয় না তাইজ্যা। পগারে যে সুপোরি গাছটার সঙ্গে ধলা গাই বাঁধা হতো, সেটা জড়িয়ে ধরে মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে থাকে। চোখে ওর জলের ধারা।

চুপচাপ সরে আসে আতরজান।

ঢেঁকিঘরের দাওয়ায় বসে কাঁঠালের মুচির ভর্তা বানাচ্ছিলো মরিয়ম। লবণ মরিচ দিয়ে ঝাল ভর্তা।

চোখে মুখে লালা ওঠে আতরজানের। বলে, 'মরিয়ম বু তাইজ্যারে কই গিয়া আরো মুচি পাইড়া দিতে। এ কয়টায় তো এটটু মোটে ভর্তা হইবো।'

উত্তরের অপেক্ষা না করেই ছুটে যায়। ধলা গাইয়ের জন্য পাতা ফেনের গামলাটার সামনে দাঁড়িয়ে তাইজ্যা।

'তাজুভাই, তাজুভাই। মরিয়ম বু কইছে আরো মুচি পাইড়া দিতে গাছে উইঠ্যা।'

'পারুম না আমি। আমার কাম আছে। ধলারে ফেরত আনতে যামু।'

'হ যাও। নায়েবের পেয়াদা তোমারেও বাইন্ধা রাখবো তোমার গাইয়ের লগে। দেখছোনা হের পিছে পিছে লাঠি লইয়া দুইটা মোচওয়ালা পেয়াদা হাঁটে?

কথা বাড়ায়না তাইজ্যা। পুকুরের পুব পাড়ে একটা জারুল গাছ পানির দিকে ঝুঁকে রয়েছে। সেদিকে এগিয়ে যায়। লম্বা লম্বা হেলেঞ্চার বন গাছের ছায়ায়। এক দঙ্গল ডাহুক পোকা ধরছে ঘাসের ফাঁক থেকে।

পা মেলে বসে পড়ে তাইজ্যা ঘাসের ওপর। উদাস চোখে চেয়ে থাকে দূরের বরাক বাঁশঝাড়ের দিকে।

মচির ভর্তা খাওয়ার কথা ভুলে গেছে আত্তি তাইজ্যার কাঁদাকাটি দেখে। নিঃশব্দে ওর পেছনে এসে দাঁড়ায়। ঘাসের একটা ডগা তুলে নিয়ে কানের ভেতরে ফরফরি দিতে থাকে তাইজ্যার।

চমকে উঠে ফিরে তাকায় তাইজ্যা।

'তাজুভাই।'

'কি ?'

'আমারে একটা ডাহুক ধইরা দিবা ছটকি পাইতা ?'

পাখি ধরার ফাঁদকে ছটকি বলে ওরা। ওটা পেতে বিলে বক ধরে। মাঠে শালিক চন্দনা ধরে আর পুকুরের নামায় কাইম আর দোয়েল পাখি।

'না। আমি ছটকি বানাইতে জানিনা।'

'মিছা কথা। জানো। মরিয়ম কইলো না, তুমি কততো পক্ষী ধরো ফাঁদ পাইতা। এক জোড়া কোড়া ধইরা দিছো মরিয়মরে আর সন।'

কথার জবাব দেয় না তাইজ্যা।

'শোনো। বাঁশ মুড়ায় পানিকাউড়ি খালি ডাকে। মগডালায় বাসা বাঁধছে। চুপসে গিয়া ছা পাইড়া আনবা তাজু ভাই। পানকাউড়ির ছা সরিষা তেল দিয়া ভুনা কইরা চাইল ভাজার লগে খাইতে যা মজা না! ই-ই-ই!'

জিভ দিয়ে শব্দ করে আতরজান। মুখে পানি এসে গেছে ওর বলতে বলতে।

'অই তাইজ্যা। তুই কি করতে আছস পুকুরের নামায় ?'

ওকে খুঁজতে এসেছে মরিয়ম।

'কি করতে আছি দেখোনা ? খোয়াব দেখতে আছি।

'খোয়াব দেখতে আছস ? দিনের বেলায় বইসা বইসা কেউ খোয়াব দেখে নাকি ?'

'হ দেখে। নায়েব হালার পুতেরে হালের পাচন দিয়া পিটাইয়া আমার ধলারে লইয়া আসুম, হে খোয়াব দেখতে আছি।'

'খোয়াব রাইতে দেইখো সোনার চান্দ। নানায় এখন বড় গরম। চাড়াইল্যার পুকুর দেখতে যাইবো। তোরে লগে লইয়া যাইবো।'

'আমি যামুনা। কইয়া দেও আমি যামুনা।'

'ক্যান? গোসা কইরা মশা খাইবি?

'না। চাড়াইল্যার দীঘির পাড়ে তেতই গাছে ভুত আছে। গাছটার তলায় গেলে রাইতে আমারে ভুতে ধরে। ঘুমের মধ্যে আমি বোবা হইয়া যাই। বোঙ্গা ভুত।

'ধ্যেৎ। তুমি বেটা ছেইলা না তাজু ভাই? ভুতেরে ডরাও তুমি? চলো চলো। নানায় ডাকতে আছে।' তাইজ্যার চুলের কেশর ধরে টেনে তোলে আত্তি।

তিন

গ্রামের মাথায় বাথান। নদীর পাড়ে। ধানের টিবি বাথানে। ফাঁকে ফাঁকে বিরাট বিরাট খড়ের পারা। বাড়ির সীমানায় দাঁড়ালে দূর থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। গেদু মাতবরের আর্থিক প্রাচুর্যের সাক্ষী।

মুনি কামলা বদলাদের বিশ্রাম নেই এক দণ্ড। সেই কাক ডাকা ভোরে দল বেঁধে ধান কাটতে নেমে যায়। কেটে শেষ করতে হবে ধানের বোঁটা শুকোবার আগে। বেশী শুকিয়ে গেলে কাঁচির আঘাতে ঝরে যায় অর্ধেক। আরো ঝরে ভারের দু'প্রান্তে দু'বোঝা বেঁধে ক্ষেত থেকে আনবার সময় দুলুনি খেয়ে। বোঝার ভারে বেঁকে যায় বরাক বাঁশের বাঁক, বেঁকে যায় বদলাদের ঘাড়।

সন্ধ্যার দিকে শুরু হয় মাড়াই। শক্ত সমর্থ বলদ জুড়ে নিকানো উঠোনে মাঝ রাত তক চলে মাড়াইয়ের কাজ। ঘামে ফানা ফানা হয়ে যায় বলদের পাল, ধুলো আর ধানের হুংয়ে শরীর ঢাকা পড়ে বদলাদের।

মাঝরাততক প্রায়ই বাথানে বসে থাকে মাতবর। খড় ঝেড়ে ধান আলগা করা দেখে। পাল্লা পাথর দিয়ে মেপে নেয় কামলারা, সেটার হিসেব মেলায়। কখনো কখনো রাতে আর ফেরা হয়না মাতবরের। মাটিতে পাটি আর কাঁথা বালিশ পেতে ঘুমোয় শুকনোয় তোলা গাছ নৌকার ছৈয়ের নীচে।

পাশে বসে হুঁকো সেজে দেয় মুনি কামলারা। কড়া তামাক আর খয়ের সুপারি দিয়ে পান বানিয়ে শিথানের পাশে রেখে দেয়।

শুয়ে শুয়ে এ পর্যন্ত কত মণ ধান মাড়ানো হলো, কত মণ লাগিত করবে, কত মণ গোলায় তুলবে, তার যোগ বিয়োগ মেলায় মাতবর।

কাঁথার ভেতর পা মেলে দিয়ে আদরের স্বরে ডাকে 'হাশেম।'

'নানা।' ছোকরাগোছের মুনি হাশেম। মাথায় বুদ্ধিসুদ্ধি কম। টাইফয়েড হয়েছিলো ছোটবেলা।

'দে তো নাতি পা দুইটা একটু টিপা দে। ঠাণ্ডায় অবশ লাগতাছে। বয়সে ধরছে রে। মজিদের হাতে সংসার তুইলা দিয়া মসজিদে পইড়া থাকনের দিন আইয়া গেছে।'

মজিদ মাতবরের বড় বিবির ঘরের বড় ছেলে। না পেয়েছে বাপের বৈষয়িক বুদ্ধি, না দৈর্ঘ্যে প্রস্থে বিশাল শরীর। বাপ যে ভাবে পয়সা সামলায়, ছেলে সে হারে দু'হাতে ওড়ায়।

মাতবর সদরে কোর্ট-কাচারি করতে গেলে হাত সাফাইয়ে লেগে যায় মজিদ। কাহন কে কাহন সুপারি নারিকেল বেপারী ডেকে বেচে দেয়। গোলা থেকে দশ বিশ মণ ধান সরিয়ে ফেলে।

বাপের সঙ্গে আরেক ক্ষেত্রে অমিল পুত্রের। ছেলে জোয়ান মর্দ হয়েও বিয়ে করেনি, অথচ গেদু মাতবরের এ পর্যন্ত তিন বিয়ে। বড় বিবি মজিদের মা। সেই কোন অকালের বছর ঘরে এনেছিলো বাপ বড় মাতবর। ইসব মামুদ নিজে গিয়ে কনে দেখে পছন্দ করে ছেলের বিয়ে দিয়েছিলো।

ছেলের বউ মজিদের মা'র সঙ্গে সংসারের উন্নতি এসেছিলো ইসব মাতবরের। অকালের ঠেলায়, খেতে না পেয়ে গ্রামের চাষাভুষারা আধ মণ এক মণ ধানের বিনিময়ে জমি বন্ধক রেখে গেছে ইসব মামুদের কাচারীতে। ফেরত নিতে পারেনি কেউ, ফেরত দেবার মত দয়া আসেনি ইসবের। সাদা কাগজে টিপসই দিয়ে গেছে লোকেরা, সেটার জোরে দলিল টলিল পাকা পোক্ত করে নিয়েছে ঝানু মাতবর।

'বউ, বড় বউ আমার ঘরের লক্ষ্মী। আকালের বছর আইলি মা তুই। আর সয় সম্পত্তি কততো বাইড়া গেলো।'

মজিদ জন্মায়নি তখনো। পুত্রবধূ গর্ভবতী হবার আগেই নাতির নামকরণ সেরে ফেলেছিলো দাদা। বলেছিলো গেদু মাসুদকে কাছে ডেকে, নাতি হইলে নাম রাখব মজিদ মিয়া আর নাতনী—

ভেবে বলেছে, জোলেখা বিবি রাখবা আমার বড় নাতিনের নাম।

লাজুক হাসি হেসে চুপ করে থেকেছে গেদু। প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়েছে অন্তঃস্বত্বা স্ত্রীর দিকে। বুকের ভেতর আদর অনুভব করেছে কিশোরী বধূর জন্য।

উঠোন ভর্তি আধ শুকনো ধান। সেগুলো ঝাড়ো, কুলোয় করে উত্তরে বাতাসে ধরে চিটা আর হং ছাড়াও, পানিতে ভিজিয়ে রাখো

দশ বারো দিন যেগুলো সেদ্ধ করা হবে সেগুলো, তারপর ভাগে ভাগে গোলায় উঠাও। কত নাম ধানের। কত রং। কোনটা মোটা, কোনটা সরু, চ্যাপ্টা কোনটা। গন্ধেও কি মিল আছে এক ধানের সঙ্গে আরেক ধানের ?

গোলা কে গোলা সামলাবে কে ? কাজের বেটিদের সঙ্গে ঝগড়া-ঝাটি খিটিমিটি করবে কে ভোর থেকে রাত তক ?

বছর বিয়ান্তী স্ত্রী মজিদের মা। নিজের কাচ্চা বাচ্চা নিয়েই ব্যস্ত। সংসার সামলাবার সময় কোথায় ?

রাতে নিজের বিছানা ছেড়ে স্ত্রীর বিছানায় উঠে আসে গেদু মামুদ। শক্ত সমর্থ কাঁচা শরীর গরম হয়ে উঠেছে।

'মজুর মা, ঘুমাইছো ?'

মজিদের আদরের ডাক নাম মজু।

'না।' অন্ধকারে নড়ে ওঠে স্ত্রী।

'কাছে আসো। তোমার[illegible]'

'[illegible]? [illegible] মুখ নাই, [illegible] [illegible]র মধ্যে। [illegible]ছে। [illegible] আছে আমার ?'

[illegible]র। বিরক্ত হয় মনে মনে। শুকনো কণ্ঠে বলে, 'ডাইনে একটা, বামে একটা, পেটে একটা। আমি বাঁচুম কি লইয়া ?'

'আপনারই তো ছাওয়াল পান।'

ধীরে বলে মজুর মা।

'এইভাবে চলেনা মজুর মা। আমারও তো শরীল আছে। গতর ক্ষেইপা গেলে কি করি কওতো ?'

'কি করবেন আবার ?' অন্ধকারে মুখ দেখা যায়না বড় বউয়ের, 'আরেকটা নিকা করবেন।'

'কি কইলা ?' উৎসাহে ঘনিষ্ঠ হতে চেষ্টা করে। গেদু পুত্র সামুর আড়াল ঠেলে।

'কইলাম, আমার শরীলে কুলায় না। আপনার খেদমত চলে না পোয়াতি শরীরে। চাইরটা তো হালাল।'

'হ। আমিও তো হেই কথাই কই।' সাহস বাড়ে গেদুর, 'তোমারও তো খেদমত আত্তির দরকার। বড় বইনের মত দেখবো। পিঁড়িটা বদনাটা আগাইয়া দিবো। খাটের উপর পায়ের উপর পা তুইলা দিয়া হুকুম করবা—'

হেঁ হেঁ করে হাসে গেদু, 'হুকুম করবা, ও ছোট বউ, আমার চুলে বিলি কইরা দে তো। অজুর পানিটা আন তো পুকুর থন। সামুটারে একটু পগারে ঘুরইয়া আন, খালি ট্যাঁট্যা করতে আছে একটানা।'

'হুঁ।' সংক্ষিপ্ত উত্তর বড় বউয়ের। বুঝতে পারে, ওর ভাটির শরীরে আর জুত পায়না মাতবরের পুত। মাতবর আর ওর সন্তানদের উৎপাতে শুকনো বুকে রসকসও নেই একটুও। সব যেন ফুরিয়ে গেছে সময়ের ব্যবধানে।

মজিদের নামের শেষে মামুদ জুড়ে দেয়নি গেদু। ছেলের নাম অনুমোদন করেছে মসজিদের মৌলভী সাহেব। আকীকা খেয়ে বলেছে—'আবদুল মজিদ খুব ভাল নাম। আলহামদুলিল্লাহ। নেক বখত হবে ছেলে বড় হলে।' ছেলের গাল টিপে আদর করে গেদু। ভাবে, মজিদ বড় হলে ছেলেকে সদরে পাঠাবে, কলেজে পড়িয়ে বি.এ. এম.এ. পাস করাবে। শিক্ষিত পুত্রের বাপ হওয়ার ঘোর মাতবরের চোখে।

মক্তবে যায় মজিদ বাড়ির কাজের লোকদের হাত ধরে। যাওয়া তকই সার। ওখান থেকে দুষ্ট ছেলেদের সঙ্গে পাটক্ষেতের আল ধরে হারিয়ে যায় মাঠে। রাখাল ছেলেদের সঙ্গে ডাংগুলি খেলে কি চাঁউস ঘুড়ি উড়ায় অথবা বিলের কাদা পানিতে নেমে পোনা মাছ ধরে।

বিকেলে যখন হাত পা ঝেড়ে স্লেট পেন্সিল বগলে চেপে বাড়ি ফেরে ছেলে, দেখে বড় বউয়ের চোখ জুড়িয়ে যায়। মাথায় হাত বুলায়, 'আয় দুধ ভাত খাবি।'

'না মা দুধ ভাত খামুনা। চিতই পিঠা খামু। গুড় আর নারিকেল দিয়া।'

তক্ষুণি তক্ষুণি চিতই পিঠা তৈরির ধুম পড়ে যায় বাড়িতে। সাজিকে সাজি গরম পিঠা। বাপের বড় ছেলে মজিদ মিয়া। মক্তব

থেকে এসেছে সারা দুপুর পড়ালেখা করে। ছেলের ইচ্ছা কি আর অপূর্ণ রাখা চলে ?

গেদু মাতবর কাছে ডাকে মজিদকে। পিঠে হাত বুলোয়, 'বাজান আইজ তোমারে বন্দরে লাইয়া যামু। কততো মানুষ কততো দোকান, বেচাকেনা—'

'আমারে কি কিনা দিবা বাজান ?'

'কি চাও তুমি ?' খুশীর ঝিলিক গেদু মামুদের দৃষ্টিতে।

'আমারে একটা বাঁশি কিনা দিবা, লাঠি বিস্কুট দিবা, আম কাটনের ছুরি কিনা দিবা, আর—' ভেবে পায়না সাত বছরের মজিদ আর কি কি চাই ওর।

শেষে বলে, 'আর জোতা কিনা দিবা। মচর মচর জোতা।'

'হ জোতা দিমু তোমারে। টুপি দিমু, জরীওয়ালা টুপি, সুফি সা'বের টুপির লাহান টুপি। আর একটা সিল্কের আছকান কিনা দিমু।'

'জরির টুপি আর আছকান ?' খুশীতে ঝলমলিয়ে ওঠে ছেলে, 'আমার বিয়া নি বাজান ? আছকান পাগড়ি পইরা বিয়া করতে যামুনি আমি ?'

ছেলের কথায় মিটি মিটি হাসতে থাকে গেদু মামুদ। সর খাওয়া বেড়ালের মত।

'সোন্দর নি কইন্যা বাজান ? সোনকাইছের মতন নি ?' ওটুক ছেলেরও উৎসাহ বিয়ের কথা শুনে।

'না মজু মিয়া', ছেলের চুলের গোছায় হাত বুলোয় বাপ, 'এখন তোমার বিয়া ক্যান দিমু বাপ ? তুমি মক্তব পাস দিবা, স্কুল পাস দিবা, কলেজ পাস দিবা। তারপর তোমার লাইগা হাতির পিঠে কইরা নতুন বউ নিয়া আসুম। একদম ডালিম ফুলের রং বউ।'

বাপের দিকে চোখ বড় বড় করে চেয়ে থাকে মজিদ।

'তয় যে কইলা আছকান টুপি পিন্দা আমি—'

'ঠিকই তো কইলাম, তুমি সাইজা গুইজা আমার লগে যাইবা। বাজানের বিয়া খাইতে যাইবা। তোমার লাইগা আরেকটা মা আনুম।

একদম আলতার রং কইন্যা। তোমারে কততো আদর করবো। তোমারে কালিজিরা চাইলের ভাত রাইন্ধা খাওয়াইবো, লাল মুরগীর আণ্ডা ভাইজা দিবো, সাজাইয়া গুজাইয়া স্কুলে পাঠাইবো।'

হাত তালি দিয়ে ওঠে মজু, কি মজা, বাজানের বিয়া। আমি লগে যামু বাজানের। আছকান পিন্দা, মচর মচর জোতা পিন্দা বিয়া খাইতে যামু। নতুন মায় আমারে বিলে পুঁটি ধরতে যাইতে দিবো নি বাজান? মায় খালি বকে গায়ে কাদা লাগাইয়া আইলে।'

'দিবো না ক্যান, দিবো। হেওতো পোলাপান মানুষ। খেলবো তোমার লগে মজু মিয়া।' চোখ বাইন্ধা চোর ধরা খেলবো, খেজুরের বিচি দিয়া টোকাটুকি খেলবো।'

খুশী মজিদ। উৎসাহের চোটে ছুটে গিয়ে দেয়ালের খুঁটিতে টাঙ্গানো আয়নায় মুখ দেখে। চুলে তেড়ি কাটে কাঁকই দিয়ে। বলে, 'বাজান, আমারে একটা কচ্যা রংয়ের গামছাও কিনা দিবা। আছকানের লগে পিন্দুম।'

[illegible]। হলদে পাখির মত চঞ্চল। সারা বাড়ি ঘুরে বেড়ায় হাল্কা পায়ে। পগারে দাঁড়িয়ে টোটা দিয়ে বেতফল পাড়ে, জংলীলতা দিয়ে চাটাই বোনে, দোয়েল পাখির নকল করে শিস দেয়।

[illegible]। সাঁঝ না হতেই বাড়ি ফিরে আসে গেদু মামুদ। বাথানে এখন আর রাত কাটায় না। ধানের হিসেব আত্তি গোমস্তাদের ওপরে ছেড়ে দিয়ে বলে, 'গতরটা ম্যাজ ম্যাজ করতে আছে সোবহান মিয়া। তুমি সামাল দেও, আমি বাড়ি যাই।'

ফাতেমার শরীরের ঘর্ষণে গতরের ম্যাজম্যাজানি কমে গেদুর। সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় খাওয়া দাওয়া সেরে কপাটে খিল আঁটে।

বড় বউয়ের জন্য বড় আটচালা ঘর বানিয়েছিলো ইসব মামুদ। ছেলের বিয়ে দেবার আগেই আলাদা থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলো। সে ঘরটায় যেন কুলান হয়না মজিদের মায়ের। এক দঙ্গল ছেলে মেয়ে। কাঁথা বালিশ চাটাই পাটি, হাঁড়ি পাতিল মটকা—একটা উটকো গন্ধ আসে ঢাকে ঘরে ঢুকলে।

আর তা ছাড়া এক বিবি পাশে রেখে আরেক বিবিকে মহব্বত করা যায় না। হায়া শরম তো আছে মাতবরের পুতের। খাটের খ্যাচ খ্যাচ ম্যাচ ম্যাচ শুনলে কি ভাববে বড় বিবির কাচ্চা বাচ্চারা?

ফাতেমা বিবির জন্য তাই আলাদা চারচালা ঘর বানিয়েছে গেদু। সামনে পেছনে টানা বারান্দা। খিড়কি খুললে ঠান্ডা বাতাস আসে মুর্তার ছায়া ছায়া ঝাড় থেকে। ঢেউটিনের ছাউনি দেয়নি গেদু। চৈত্র বৈশাখ মাসে টিনের চাল তেতে ওঠে সূর্যের তাপে। ভেতরে টেকা কষ্টকর হয়ে ওঠে। মাতবরের পুত তাই শনের চাল বেঁধেছে পাকা ছৈয়াল ডেকে। পুরু চাল ভেদ করে গরম হাওয়া ঢুকতে পারবেনা ঘরে।

চিনে জোঁকের মত ফাতেমার শরীরে সেঁটে থাকে মাতবর। বেলা করে ঘর থেকে বেরোয়, ভোরের নাস্তা-খাওয়া ততক্ষণে শেষ। মুনি কামলারা সব মাঠে চলে গেছে পান্তাভাত খেয়ে। মক্তবের পথ ধরেছে মজিদ।

বাপের তেমন দেখা পায়না বড় ঘরের ছেলে মেয়েরা। মনে মনে অভিমানে ফোলে মজিদ, 'বাজানও আমার লগে কথা কয়না, নতুন মাও আমারে আদর করেনা। বাজানে কইছিলো, নতুন মা আমার লগে খেলবো, আমারে রুমালে ফুল তুইলা দিবো। কই, দেয়না ক্যান?'

শুনে মাঝবয়েসী কাজের বেটিরা হাসে, 'তোমার নয়া মায় তোমার [illegible], [illegible] কি? দেখোনা বেশী খেইলা খেইলা মাতবরের চোখ গাতায় বইসা গেছে, সিনার হাড্ডি বাহির হইয়া আইছে।'

রসিকতাটা বুঝতে পারেনা মজিদ।

'কি কইলা?' চিন্তিতভাবে প্রশ্ন করে।

'কইলাম, বালেগ হও মিয়াভাই। আর ক'টা বচ্ছর। তোমার লাইগাও সোন্দর কইন্যা আনবো মাতবর। তুমিও বাপের মত ঘরের ঝাপ নামাইয়া দুপুর তক—'

'কি দুপুর তক?'

কথা ঘুরিয়ে নেয় বেটি, 'দুপুর তক বউয়ের গলা ধইরা ঘুমাইবা।'

চার

নতুন বউ ফাতেমা আর নতুন থাকেনা তিন বছরের মাথায়। কৈশোরও যৌবন একসঙ্গে এসে একই সঙ্গে যেন বিদায় নেয়। উঠতি বয়সের সেই প্রাণচাঞ্চল্য নেই আর। ঘুরে বেড়ানো নেই বাড়ীময়। পুকুরে নেমে ঘন্টা কে ঘন্টা সাঁতার কাটা নেই। ডুবিয়ে ডুবিয়ে মাঝ পুকুর থেকে শালুক তোলা নেই।

বড় বউয়ের মত ফাতেমাও বছর বিয়ান্তি। দু'বছরে দুটো জন্মিয়েছে। তিন বছরের মাথায় আরেকটা পেটের ভেতর ফুটবল খেলছে।

হলদে লালে মেশানো গায়ের উজ্জ্বল রং মিইয়ে গেছে ফাতেমার। পাংশু ঠোঁটে স্বাদ পায়না গেদু মামুদ। ঝুলে পড়া মাইদুটো দেখে চোখ ফিরিয়ে নেয়। কণ্ঠার হাড়ে হাত রাখতে ইচ্ছে করেনা আর। হাড়-সর্বস্ব শরীর এখন ফাতেমার। চোখের কোণে কে যেন ছ্যাঁকা দিয়ে কালো করে দিয়েছে।

বাড়ির ধানভানা মেয়েলোকরা মাতবরের থমথমে মুখ দেখে মুখ টিপে হাসে, 'কইয়া দিলাম ছৈল্যার মা, মাতবর আবার নিকা করবো। বড় বৌর তো গতর পোলা মাইয়া পয়দা কইরা কইরা শেষ, মেঝোটাও বিয়াইয়া বিয়াইয়া আধা শেষ। এইবার সেজোটা আনবো মাতবর। হের দাদা বেঙ্গা মামুদের আছিলো ছয় বিয়া, পরদাদা কুরকুইর‍্যার সাত বিয়া, হেও চাইর পাঁচটা না কইরা থামবোনা।'

'হ বইন, ঠিকই কইছো। মাতবরের রসে দারুণ তেজ। এক ফোঁটাতেই কাম। এক রত্তি পেটে পড়লেই লগে লগে পেট লাইগা যায়। দেখলা না বড় বউয়ের —কয়টা হইলো এই তক?'

হাতে গোনে ছৈল্যার মা, 'সাতটা বইন। ফাতেমা বিবির আড়াই-খান। দুইটা আইছে, আরেকটা আইতে আছে। নিশান তাক করলে মাতবর, ফিরেনা গুলি একবারও।'

মাঝে মাঝে ফাতেমা বিবির চার চালা ছেড়ে বড় বিবির আট চালায় উঠে যায় গেদু মামুদ। রাতের অন্ধকারে উঠান পার হয় নিঃশব্দে।

'বড় বউ।' পিঠে মৃদু টোকা দেয়।

ঘুমের ঘোরে কোঁ কোঁ শব্দ করে মজিদের মা।

'আইলাম তোমার কাছে। ফাতেমার শরীর ভালা নাই। তোমার লগে—'

'আমার শরীরও তো ভালা নাই।'

'কও কি মজিদের মা? তোমার আবার—' চমকে ওঠে গেদু।

'হ। আইজ তিন চার দিন ধইরা খালি বমি হইতে আছে। চুকা চুকা ঢেকুর।'

পানি জোকের মত সঙ্কুচিত হয়ে যায় গেদু মুহূর্তের জন্য। কি আপদ রে বাবা। দুই বিবি এক সঙ্গে হামেলা। আমি যাই কার কাছে এখন? মনে মনে বিরক্ত হয় মাতবর পুত।

'আমি আর পারিনা মাতবর সাব। আপনে আমারে রেহাই দেন।'

'এখন আর রেহাই দিয়া কি হইবো? একবার পেট যখন লাগাইছো, তখন তো আর নতুন কইরা লাগান যাইবোনা।'

'আমি লাগাইছি না আপনে লাগাইছেন?' মৃদু প্রতিবাদ করে মজুর মা।

ঝগড়া করার অবস্থা নেই গেদু মামুদের। চামড়ার নীচে উত্তাপ বাড়ছে। ক্ষিপ্র হাতে জাপটে ধরে মজুর মাকে। দাড়ি গোঁফ ভরা খসখসে গাল ঘসতে থাকে ওর গায়ে।

নড়বার শক্তি নেই মজুর মা'র। মরার মত পড়ে থাকে গেদুর বুকের নীচে। দমটা বন্ধ হয়ে আসতে চায়। নতুন করে বমি ঠেলে ওঠে গলা দিয়ে।

উঠবে কেমন করে? ওকে হাত পা দিয়ে পেচিয়ে ধরেছে মাতবরের পুত।

দুই ছেলের পর এক মেয়ে। দুধে আলতায় মেশানো গায়ের রং। কালো চোখের তারা দিয়ে পিটপিট করে তাকায়।

মেয়ের মুখ দেখে খুশীতে বুক ভরে ওঠে ফাতেমার। গালে গাল চেপে আদর করে। গুন গুন করে ছড়া কাটে মেয়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে।

নিজ হাতে বোনা নকশী কাঁথায় পেচিয়ে মেয়েকে গেদু মামুদের কোলে

তুলে দেয়। পাণ্ডুর ঠোঁটে হাসির ঝিলিক এনে বলে, ‘দেখলেন, কেমন রাজ কৈন্যার রূপ আপনের কৈন্যার?’

কথা বলে না গেদু। শক্ত হয়ে বসে থাকে। মনে মনে হিসাব গোণে, ‘বড় বউয়ের সাতটা, মেজো বউয়ের তিনটা। আরেকটা আসতে আছে মজিদ গো ঘরে। এ দেখি, ব্যাঙয়ের পোনা সব আমার সংসারে।’

‘একটা নাম রাখেন না মাইয়ার? খুব সোন্দর নাম। চান্দের তারিখ মিলাইয়া ভালো নাম।’

‘আমি নামের কি বুঝি? মসজিদের মৌলবী সা’বের কাছে খবর পাঠাও। হের কাছে অনেক আরবী উর্দু নাম আছে।’

বায়না ধরে যেন ফাতেমা, ‘না। মৌলবীর কাছে পাঠামু ক্যান? আপনের ঝি, আপনেই তো হের পছন্দমত নাম ঠিক করবেন। আইজ মাইয়ার দাদা বাইচা থাকলে, হেই বুড়াই মাইয়ার আকিকা দিতো দশ গেরাম দাওয়াত খাওয়াইয়া, নাতনীরে সোনার খাড়ু সোনার বালা পরাইয়া দিয়া—’

আলোচনা লম্বা করার মত মনের অবস্থা নেই গেদু মামুদের। দশ বিশটা গরু ছাগল জবে দিয়ে আকিকা করারও ইচ্ছে নেই।

বিরক্ত শোনায় ওর কণ্ঠস্বর, ‘দশ গেরাম জেয়াফত খাওয়ায় মানুষ বিয়া শাদী করনের সময়। আকিকায় অতো পয়সা উড়ামু কি দিয়া? আমার কি সিন্দুক ভরা সোনার পাথ্থর আছে নাকি?’

‘তা হইলে নামটাই রাইখা দেন।’

মুখ কালো হয়ে ওঠে ফাতেমার।

‘নাম। যোবেদা শাহেদা খোদেজা—একটা কিছু রাখলেই হইলো। নামে কি আসে যায়, কও?’

যোবেদা নামটাই পছন্দ হয় ফাতেমার। মোসাম্মত যোবেদা খাতুন। মনে মনে আওড়ায়। মেয়ের গালে চুক করে চুমু খায়।

আবার বড় বউ হামেলা। মেজো বউ পোয়াতি। দুটোর গায়েই কেমন যেন পগারের পাতা পচা গন্ধ। এমন সময় গেদু মামদ যায় কই? চড়াও হয়ে দেখেছে, দুটোই এক রকম। মরা লাশের মত চিৎ হয়ে পড়ে থাকে সিনার নীচে।

মাঠে নতুন ধান লাগানো হয়েছে। পাকতে পাকতে আরো তিন

মাস। বাথান খালি। গরু মহিষের চালা সব খালি। ওখানে গিয়ে যে রাত কাটাবে ঠাণ্ডা বাতাসে শুয়ে, সে উপায়ও নেই। লোকে পাগল বলবে না? ভাববে, 'বাড়িতে বউ ঝির সঙ্গে কাইজা কইরা মাতবর বাথানে গিয়া রাইত কাটায়।'

ভেতর বাড়ি অসহ্য মনে হয় গেদুর। বাড়ির মাথায় মসজিদের উল্টো দিকে কাচারি ঘর। দিনের বেলা বেপারী মহাজনদের সঙ্গে টাকা পয়সার লেন দেন চলে কাচারিতে। রাতের বেলা কামলা মুনিরা কাঁচা মেঝেতে মাদুর পেতে ঘুমোয়।

ওখানে চৌকি লাগায় মাতবর। মুলি বাঁশের বেড়া দিয়ে কামরা তৈরি করে। খোলা খিড়কি দিয়ে মাঠের হাওয়া আসে। ঠাণ্ডায় শুয়ে ঘুমোতে চেষ্টা করে একলা শয্যায়। ঘুম কি আসে সহজে? হাত পায়ের তালু দিয়ে গরম ভাপ বেরোতে থাকে সারা রাত। বারবার উঠে গিয়ে ছাড়া বাড়ির দিকে হাঁটাহাঁটি করে নিঃশব্দে।

তারাকে হঠাৎ করে দেখেছে মাতবর সেদিন হাটে যাওয়ার পথে। পাট ক্ষেতের উঁচু নীচু আল ধরে সরু পথ। উল্টো দিক থেকে আসছিলো তারা। রুসা ছৈয়ালের মেয়ে তারা বানু।

মাথায় টানা ঘোমটার নীচে উজ্জ্বল চোখ জোড়া মেয়ের। বাঁ গালের ওপর কালো গোলাকার তিল।

চোখ ধেঁধে গিয়েছিলো গেদু মামুদের। রুসার ঘরে পূর্ণিমার চাঁদ যেন নেমে এসেছে। সিঁদুরে আমের রং মেয়ের ডিমেল মখে। যেমন কচি, তেমনি টসটসে ঠোঁট জোড়া।

রুস্তম আলি ছৈয়ালের ডাক নাম রুসা ছৈয়াল। গ্রামের পশ্চিম পাড়ার মাথায় ছোট্ট কুঁড়েঘর ওর। বাড়ি বাড়ি উলু শন দিয়ে মানুষের ঘরের চাল ছাওয়ার কাজ করতো রুসা। পটু হাতে কড়ি বর্গা বাঁধতো পাকা বেত দিয়ে। তারপর শুকনো শন বিলি করে বিছাতো চালের ওপর। এক বার ছানি দিলে সে চাল ঢেউটিনের চেয়েও মজবুত। দশ বছরেও এক ফোঁটা পানি গড়িয়ে পড়বে না ভেতরে।

ফাতেমা বিবিকে ঘরে এনে যে চালা ঘরটা তৈরি করিয়েছিলো গেদু মামুদ, সেটাও ছেয়েছে রুসা। পাকা হাতে পাকা ছাউনি, দেখতে জমিদারের কাচারি ঘরের মত মজবুত আর সুবিন্যস্ত।

সে রুসা একদিন পা পিছলে পড়ে গেলো ভুঁইয়া বাড়ির শফিক মেম্বরের চাল ছাইতে গিয়ে। ঠাঠা দুপুর। সামনের উঠানটা লোহার মত শক্ত চৈত্রের কড়া রোদে শুকিয়ে। পড়ে মূর্চ্ছা গেলো রুসা। সম্বিত যখন ফিরে এসেছে, ডান পা'টা তখন হাঁটুর ওপর ভেঙ্গে দু'টুকরা। চামড়ার নীচে কটকট শব্দ করছে ভাঙ্গা হাড়।

কত মালিশ, কত ঝাড় ফুঁক, কত কবিরাজ বদ্যি, কত মাগুর তেল—কিছুতেই কিছু হলো না। জীবনের মত লুলা হয়ে রইলো রুসা। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে। ভাঙ্গা পা নিয়ে তো আর ঘরের চালে ওঠা যায় না। ফলে ছৈয়ালগিরির ইতি রুস্তম আলির। বংসানুক্রমিক ত্তির ছেড়ে ঘরে বসে বসে কুলা চালনি আর চাটাই বোনে। ওতে আর কয় পয়সা আসে? হাটে নিয়ে যে সেগুলো বেচবে, সে জোরও নেই ভাঙ্গা পায়ে।

লেংড়া লুলা হওয়ার আগেই তারাবানুর বিয়ে দিয়েছিলো রুস্তম। নীলগঞ্জের কারিগর বাড়িতে। তাঁতের কাজ কারিগরদের। কাঁচা পয়সা শাড়ি লুঙ্গি বেচে। মেয়ের রূপ দেখে এক কথায় পছন্দ হয়ে গেছিলো ছেলের বাপের। রূপোর চুড়ি আর কানপাশা দিয়ে পাল্কি চড়িয়ে বউ নিয়ে গিয়েছিলো ধুমধাম করে।

খুশিতে সারা রাত ঘুমোতে পারেনি রুস্তম। সচ্ছল গেরস্ত ঘরে গেছে তারা বানু, এর চেয়ে আনন্দের বিষয় আর কি হতে পারে তুচ্ছ এক ছৈয়াল বাপের?

কিন্তু কপালে সুখ লেখা ছিলনা রুসার। নিজেও চাল থেকে পড়ে গিয়ে লুলা হলো, মেয়েও এক দিন ভর সন্ধ্যায় এক বস্ত্রে ফিরে এলো বাপের ঘরে।

পাঁচ বছর অপেক্ষা করেছে ইসা কারিগরের পুত মুসা কারিগর। এতটা কালেও গর্ভবতী হয়নি মেয়ে। বাঁজা মেয়ে, অলক্ষুণে অপয়া মেয়ে। অনেক তাবিজ তুমার করেছে ইসা কারিগর। টোটকা ফোটকা কিছু বাদ রাখেনি এত বছর। ফল হয়নি কিছুতেই। নাতির মুখ দেখার সৌভাগ্য হয়নি কারিগরের।

ধূলো পড়া দিয়েছিলো আশু মুন্সী। পুরো এক মুঠি ধূলো খাইয়েছে তারাকে। তারপর ওর চেহারার দিকে চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে থেকে, পায়ের খড়ম দিয়ে পিঠে গুণে গুণে এগারো বার জোরে জোরে বাড়ি মেরে গম্ভীর স্বরে বলেছে, 'এই বউ কোন দিন হামেলা হইবো না। এর লগে জ্বীন আছে। জ্বীন ভুতে এর গর্ভদানি দখল কইরা নিছে। এ মাইয়া

এখন ভুতের হাওলা। বুঝলেন কারিগরের পুত, জ্বীন ভুতে এ মাইয়ার লগে জেনা করে আইজ নয় বছর। বালেগ হওনের আগে থন। এ আপনার পুতের আওতার বাইরে।'

এক তালাক—দুই তালাক—তিন তালাক—বাইন তালাক।

মুসা কারিগর পাকা তালাক দিয়ে বাপের বাড়ি খেদিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে তারা বানুকে। অমন খবিস জ্বীনের লগে খারাপ কাম করা বউ বাড়িতে রাখাও তো ইজ্জতের খেলাফ।

পয়সা থাকলে মেয়ের অভাব আছে দেশে? ইসা কারিগর আবার বিয়ে দেবে মুসার। নতুন নারী আসবে জীবনে, আগেরটার কাঁচা গতর ফাও লুটেছে এতটা কাল। মনে মনে খুশী মুসা। গোটা চারেক ফুল-পাড় শাড়ি বুনে তাকে তুলে রেখেছে অনাগতা বধূর জন্য। নিজে টাকু চালিয়ে বুনেছে। অনুভূতিটা বেশ রোমাঞ্চকর।

লুলা বাপের ঘরে বসে তারা বানু আজ দু'ছর। ওকে নিয়ে জ্বীন-ভুতের মুখরোচক গল্পটা ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশের গ্রামে। ভুতের আছরওয়ালা তালাক পাওয়া মেয়ে—কে এমন বাঁজা আপদ ঘরে নিয়ে তুলবে? ওটার ভুত গিয়ে বাড়ির অন্য সব মেয়েদের ওপর ভর করবেনা? জেনা করবেনা ওদের সঙ্গে?

ভাঙ্গা পায়ের ওপর থুতনি ভর দিয়ে ভাবে রুস্তম। জোয়ান মেয়েটাকে নিয়ে কি করবে, ভেবে পায় না। বাড়ি বাড়ি ঢেঁকি ভানার, ঘর লেপার, ধান সেদ্ধ করার কাজ করে তারা। সন্ধ্যার আগে বাড়ি ফিরে আসে। লুলা বাপের পায়ের কাছে চুপচাপ বসে থাকে।

তারা বানুকে পেয়ে মাঝ বয়েসী গেদু মামুদের শরীরে যৌবনের নতুন জোয়ার আসে। খুশিতে চেহারা কাঁচা হয়ে ওঠে। আদরে সোহাগে ভাসিয়ে নিতে চায় নতুন বধূকে। পাঁজা কোলা করে শূন্যে উঠিয়ে ঘরময় চক্কর খায়।

'সোনা বউ। চাঁদ সেতারার মত খুবসুরত তুই। তোরে আমি মুক্তার মালা গড়াইয়া দিমু আষাঢ় মাসে ধান বেইচা। তোর বাপেরে খড়ের এক চালার জায়গায় টিনের আট চালা বানাইয়া দিমু। তোর ঘরে পোলা হইলে, পোলার লাইগা একটা হাতি কিনা আনুম পাহাড়ে গিয়া। হাতিতে চইড়া সারা রাজ্য ঘুইরা বেড়াইবো আমার পুত। পুত না, রাজপুত।'

'পুত পামু কই ? বাঁজা না আমি ?'

'কেটা কইলো তুই বাঁজা। ওই সালা কারিগরের পোলা আটকুড়া। নিজের তাকত নাই বিবিরে ভরট করনের, মিছা দোষ দিয়া ঘরের বউ তাড়াইয়া দিছে। জালিম কমিনা কাঁহাকার। আমি দুইটা দজ্জাল রাক্ষসী লইয়া আইজ তেরো চৌদ্দ বছর ঘর করতে আছিনা ? জ্বালাইয়া জ্বালাইয়া আমার কলিজা পুইড়া খাক কইরা ফালাইছেনা মইজ্যার মা আর হাড়গিলা ফাতেমা ? দিছি আমি হেগোরে খেদাইয়া তাড়াইয়া ? ভাত কাপড় দিতে আছিনা এতটা কাল ?'

নত চোখে তাকায় তারা বানু, 'আমার যদি পোলাপান না হয়, তখন ? জ্বীনে না আমার নালী ছিঁড়া দিছে পেটের ভিতর সান্ধাইয়া ?

'দূর দূর। ওই সব মিছা পেচাল শয়তান আশু মুন্সীর। জানস না তুই, মুন্সী নিজের নাতনীরে নিকা দিছে মুসার লগে তোরে খেদাইয়া দিয়া।' হো হো করে হেসে ওঠে গেদু মামুদ তারার গতর হাতড়াতে হাতড়াতে, 'কবে কইবো, ইসার বিবিজান—মানে মুসা কারিগরের মা'জানের উপরও জ্বীনের ভর আছে। মুসা কারিগর জ্বীনের পয়দা।'

'মানে ?' কৌতূহলে মাথা তুলে তাকায় তারা বিবি।

'মানে আবার কি ? মুসার মা'রে খেদাইতে পারলে মুন্সী হের রাঁড়ি ভাইঝিরে গছাইয়া দিবো ইসা কারিগরের ঘরে। ভাইজিটা বিধবা হইয়া চাচার উপরে খাইতে আছে আইজ ছয় সাত বছর।'

নিজের মন্তব্য শুদ্ধ করে মাতবরের পুত, 'মাগনা খাইতে আছে না। মুন্সীর বাড়ি বিনা বেতনে পেটে ভাতে বান্দি খাটতে আছে রাঁড়ি মাইয়া লোকটা।'

'আপনে এতো খবর জানেন !' মৃদু হাসে তারা গেদুর আদর পেয়ে শরীরের আনাচে কানাচে।

'জানম না ক্যান ?'

'হেইটাই তো কই, মাতবর হইলে হগল কথা জানতে হয়।'

'তোমার মনের কথাও জানে গেদু মামুদ। ঠিক ঠিক জানে।' চোখে কৌতুক টেনে বলে, 'পুত্র চাই। চান্দ সওদাগরের পুত্র লখিন্দর সদাগরের মত সোন্দর পুত্র চাই আমার সাইজা বেগমের।'

চমকে ওঠে যেন তারা বানু, 'সাইজ্যা ক্যান ? আমি তো ছোট জন। আপনের মতলব— ।'

'না না বিবিজান। অক্টাপাসের মত তারার শরীরটা বেড়িয়ে ধরে মাতবর। কপালে পানের পিকলাগানো চুমু খায় সশব্দে, ভুলে কইয়া ফালাইছি। তুইই আমার শেষ। বাপ দাদার মত ছয় সাতটা বিয়া করার সখ নাই আমার। তোর শরীরের মধু শেষ হইবার আগে দেখবি, গেদু মাতবর বুড়া হইয়া গেছে। তখন নাতনী গো লগে মস্করা করন ছাড়া আর কিচ্ছু পারেনা।,

'কি কন আপনে? আমার পোলা হইবো, পোলা বালেক হইবো, হে রে বিয়া করাইবেন, হের ঘরে মাইয়া হইবো, হেই মাইয়া যোয়ান হইবো, তারপর হেই নাতনীর লগে আপনে ঠাট্টা মস্করা করবেন, এতো বহুত লম্বা চক্কর।

নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তায় মাতবরের বড় ছেলে মজিদের কথা ভুলে যায় তারা বানু।

'ক্যান? আমাগো মজু মিয়া ব্যাডা হইয়া উঠছেলা? পড়া লেখায় দিশ নাই মিয়ার। কৈবর্তপাড়ায় ঘুইরা বেড়ায় সময় অসময়। বিয়া দিয়া ঘরে আটকামু পোলারে কাত্তিক মাসে? তো আগের ঘরের মাইয়া থাকলে মুসা কারিগরের পক্ষের হেইটারেই আনতাম বউ কইরা। তোর ফরজন্দ তো।'

পাঁচ

'তাজু ভাই, ও তাজু ভাই, ওঠো।'

দুপুরের ভাত খেয়ে বাইরের কাচারি ঘরের সামনে খড়ের গাদায় কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমাচ্ছিলো তাইজ্যা। সারা ভোর কুড়োল দিয়ে লাকড়ি ফেড়েছে রোদের মধ্যে। ক্লান্তির গাঢ় ঘুমে অচেতন।

নড়ে চড়ে পা ছড়িয়ে শোয় তাইজ্যা। মুখে বলে কি ?

'ওঠো ওঠো। বিকাল হইয়া গেছে। আমার একটা কাম কইরা দিবা তাজু ভাই।'

অনুনয় আত্তির স্বরে।

'কি কাম ?' আড়ামাড়া ভেঙ্গে উঠে বসে তাইজ্যা।

'একটা বাঁশ কাইটা দিবা মুড়ায় গিয়া। পাকা পোক্ত দেইখা।'

'কি করবি বাঁশ দিয়া তুই ? চরে গিয়া লাঠালাঠি মাথা কাটাকাটি করবি নাকি ? নদীর হেই পাড়ে একটা নতুন চর উঠতে আছে। ওইটা দখল করবো নানায় লোকলস্কর লইয়া। নমুপাড়ায় গেছি আমরা মানুষ ঠিক করতে। সড়কি নেজা বল্লম লইয়া রেডি হইতে আছে লাঠিয়া-লরা। যাবি নাকি মাইর পিট করতে ?'

'যামু। তোমার লগে যামু খুনাখুনি দেখতে।' ধোড়া সাপের মত কোমর মোড়ায় আতরজান, এখন তো আমারে একটা বাঁশ কাইটা দেও রাইতে কুপি জ্বালাইয়া চাটাই বুনুম।

'কার লাইগা ? তোর দুলার লাইগা ?'

'ধ্যেৎ। একখান বড় নানীর লাইগা, একখান মাইজ্যা নানীর লাইগা একখান বাঁজা নানীর লাইগা আর একখান আমার নিজের লাইগা। এমন ভেপসা গরম, ঘরে শুইতে মন লয়না রাইতে। চাটাই পাইতা উঠানে শুমু, রহিমা, সামু মরিয়ম যোবেদা হগলরে লইয়া।'

'তারপর ?'

'তারপর শুইয়া শুইয়া গুন গুন করইয়া সোনাজানের গান করুম।'

'আতরজানে গাইবো সোনাজানের গীত? মান্দার হাটের যাত্রা-পার্টিতে নামবি নাকি?'

'ধ্যেৎ। যাত্রায় তো নামে বাজাইরা মাইয়া লোকরা। আমি নামুম ক্যান?'

'কেডায় কইলো? আমি জানি না বুঝি! মজু মামু নানার নারিকেল সুপারী চুরি কইরা বেইচা যাত্রা দেখতে যায় না রাইত কইরা? দেখবা, কার বাজাইরা বেডি বিয়া কইরা গেরস্ত বাড়িতে আইনা তুলবো মামু। বাপের মত তামুক খায় না মজু, চিগ্রেট খায় লুকাইয়া লুকাইয়া। আরা কি খায়, কি করে বাইরে গিয়া, কেডা জানে? তুমি জানো না?'

'জানি। চল। দা আনছুস?'

'না। কুড়াল আনছি। পোক্ত বাঁশ কাটবা কুড়াল দিয়া।' বলেই দৌড়ে গিয়ে সুপারি ঘর থেকে একটা কুড়োল নিয়ে আসে আতরজান।

প্রায় একশ' হাত লম্বা একটা বাঁশ কেটে নামায় তাজু। কঞ্চি ছাড়িয়ে কেটে কেটে টুকরো করে আতরজানের মাপ মত। পনেরোটা মোটা মোটা ফালি। আগার ছোপটা টেনে পরিষ্কার জায়গায় এনে রাখে; কুমড়োর মাচায় দেওয়া যাবে।

কপালের ঘাম মোছে তাইজ্যা। কয়েকটা লাল পিঁপড়ে পিঠে পড়েছে বাঁশ ঝাড় থেকে। সুড়সড়ি দিচ্ছে ওরা, কামড়ে ধরছে চামড়ায়। এতক্ষণ কুড়োল মারাতে ব্যস্ত ছিল বলে টের পায়নি।

'ওই আত্তি। দেখতো, পিঠের পিঁপড়াগুলা ফালা তো।'

এগিয়ে এসে তাইজ্যার পিঠের পিঁপড়া ছাড়ায় আতরজান। কয়েকটা শক্তভাবে কামড়ে ধরে আছে ঘামে ভেজা চামড়া।

কৌতুকের হাসি হাসে আতরজান, 'লাল পিঁপড়ায় পিঠে কামড়াইলে কি হয়, জানো তাজু ভাই?'

'জানি। তাড়াতাড়ি মউত হয়। আজরাইলে জান কবজ করে। কবরের অন্ধকারে পিঁপড়া আছে না হাজার হাজার? মরা লাশ নামাইয়া মাটি চাপা দেওনের লগে লগে চোখে মুখে কামড়াইতে শুরু করে না বিষ পিঁপড়ারা?'

'ধ্যেৎ,' কি সব খারাপ কথা কও তুমি।' তাইজ্যার কাঁধে জোরে ঝাঁকুনি দেয় আতরজান, 'আসল কথা না জাইনা বিপদের কথা কও ক্যান?'

'কি আসল কথা ?'

'আমার নানীয়ে কইছে, পিঠে লাল পিঁপড়ায় কামড়াইলে জলদি জলদি বিয়া হয়। আর যতোটা কামড় দিবো, ততোটা বউ হইবো।'

হো হো করে হেসে ওঠে তাজু,। তয় আমারে তো এতক্ষণে দশ বিশটা পিঁপড়ায় কামড়াইয়া পিঠ ফুলাইয়া ফালাইছে। কয়টা বিয়া করুম আমি ?'

'দুই শ'টা বিয়া করবা তুমি।'

'দুই শ! কস কি? পরীর লাহান খবসুরত? যাত্রা পার্টির সোনাভান বিবির লাহান ?'

কথাটা পছন্দ হয় না আতরজানের। কপাল কুচকে বলে, 'না কাউয়ার লাহান। চাড়াইল্যার দীঘির পাড়ে তেঁতই গাছের পেত্নীর লাহান।'

'না তোর লাহান। তোর মত পেত্নীর লাহান।'

'আমি বুঝি পেত্নী ?' একটা কঞ্চি তুলে নিয়ে গুতো মারে তাইজ্যার পায়ে।

'পেত্নীই তো। পেত্নী না হইলে কি আর কেউ ভাত থুইয়া খুদ ভাজা খায় ?'

খামুনা ক্যান ? যা মচমচ করে খুদভাজা দাঁতের নীচে। ছোট্ট বেলায় নানী খাইতো, আমারেও খোলায় ভাইজা খাওয়াইতো নুন দিয়া। মনে হইলে জিহবায় পানি ঝরে, তাজু ভাই। কি কমু তোমারে ? দারুণ মজা খুদ ভাজা।'

তিন তিনটা বছর ঘুরিয়েছে কাচারির নায়েব। ধলাগাই, মন কেমন কালিজিরা চাল, দশ বারো সের ওজনের যতো রুই, কাতলা মাছ নায়েবের নাতি নাতনীর জন্মদিনে সোনার বালা, তার ওপর খবর কাগজে মুড়ে গাদা গাদা নোট তো আছেই—এতো ভেট খেয়েও বেটার পেট ভরেনি। সদরে যেতে যেতে চামড়ার জুতোর সুকতলা ক্ষয়ে গেছে গেদু মাতবরের। শেষটায় অনেক টাকা খসিয়ে চাড়ালের দীঘিটা হস্তান্তর করেছে গেদু মাসুদের নামে।

সিন্দুক খুলে দলিল পত্র ঘাঁটে মাতবর। শুকনো বিরক্তি-ভরা মুখে বলে, 'বুঝলি তাজু মিয়া, জমি জিরাত বড় কঠিন জিনিস। জোড়ানো যেমন কঠিন, সামলানো আরো বেশী। চারিদিকে জালিমরা সব হা কইরা আছে। একদম অজগর সাপের হা। পারলে আমারে শুদ্ধ আস্ত গিলা খায়।'

তেমন কিছু না বুঝেও বিজ্ঞের মত মাথা নাড়ে তাইজ্যা, 'ঠিক কইছেন নানা? নায়েব বেডা আমাগো ধলারে লইয়া গেছে। না ডাকাইতের মত? বেডা ডাকাইতের পুত ডাকাইত। দীঘিটা দিলো তিনটা বছর দেরী কইরা। ইস্ কততো বড় দীঘিরে আল্লা।'

'তুই দেখি ধলা গাইয়ের দুখ ভুলতে পারলি না আইজ তক। একটার বদল দুইটা দুধাল গাই কিনা দিলাম না তোরে? পাবনার বিলাতী বীজের গাই? বেশী দুধের ঠাণ্ডা দুইটা গাভী ধলি আর কালী।'

ধলা গাই নায়েবকে ভেট দেওয়ার পর দুটো গাই কিনেছে মাতবর। সেই সাজাদপুর লোক পাঠিয়ে দুধের বাথান থেকে আনিয়েছে। পাবনার সাজাদপুর। বিয়ানের পর আধ মণের ওপর দুধ দেয় এক একটা। খাঁটি ঘন দুধ। এত ছেলে মেয়ে নাতি নাতনী মিলেও খেয়ে শেষ করতে পারে না দিনকার দুধ।

'দেশী আর বিলাতী তো বড় কথা না নানা। ঘরের জিনিস হইল ঘরের জিনিস। নিজ হাতে পাইলা বড় করলে একটা মায়া মহব্বত হইয়া যায় না জানোয়ারটার লাইগা? আমারে পাইলা বড় করছেন না আপনে? আমি মইরা গেলে আপনের মনে কষ্ট হইবো না?'

'হইবো।' মিটি মিটি হাসে মাতব্বর, 'তাজু মিয়া মইরা গেলে আমি তামুক খাওন ছাইড়া দিমু, দুখখের চোটে জমি জিরাত সব ছাইড়া দিয়া দরবেশ হইয়া যামু।'

মাতবরের কথায় কান নেই তাইজ্যার। বলতে থাকে গম্ভীর মুখে, 'নানা, চাড়াইল্যার দীঘি মাছে গিজগিজ গিজগিজ করতে আছে। চলেন, মাছের বেড় দেওয়াই, কতো হাজার টাকার মাছ যে আছে না নানা—'

উৎসাহের চোটে উঠে দাঁড়ায় তাইজ্যা। টাকার পরিমাণ আঁচ করতে পারে না। আগের কথায় ফিরে আসে, 'আত্তিরেও পাইলা বড় করছেন না আপনে? ভাত কাপড় দিয়া মানষ করছেন না? হেরে বিয়া দিয়া পরের বাড়ী পাঠাইয়া দিতে দিলে কষ্ট হইবো না আপনের?

'হ কষ্ট হইবো খুব। হের লাইগাই তো পরের বাড়ী পাঠামু না আতরজানরে। বিয়া দিমু, এই বাড়িতেই বিয়া দিমু।'

বলে চোখে কটাক্ষ করে মাতবর। হুঁকোয় জোরে দম দিয়ে বুক ভরে ধুঁয়ো ছাড়ে।

ইঙ্গিতটা যেন বুঝতে পারে তাইজ্যা। লজ্জায় চোখ মুখ লাল হয়ে ওঠে। অজানিতে মাথাটা নীচের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

চারপাশের গ্রামের লোক ডেকেছে গেদু মাতবর চাড়ালের পুকুরে মাছ ধরতে। বর্ষার পরে এতটা কাল দীঘিতে জাল ফেলতে দেয়নি। বাসা বাঁধুক মাছেরা পানির নীচে কাদা মাটিতে, গুড়া চিংড়ি আর বৈচা মাছ খেয়ে বড় হোক শোল গজার। কালি বাউস আর রুই মৃগল।

হাটে হাটে ঢোল পিটিয়ে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। মানুষের ভিড় দীঘির চারপাশে। পলো, বোয়াল জাল, ঝাকি জাল, ধর্মজাল, লেপা জাল—যার যা হাতিয়ার, সব নিয়ে হাজির দু'দশ গ্রামের মানুষ। হল্লায় মুখর দীঘির চারপাড়।

নানা! 'এত মানুষ ডাকছেন আপনে মাছ মারতে, হেরা তো সব লইয়া যাইব ধইরা।'

'না সব নিবো না। অর্ধেক নিবো। কথা হইছে সর্দারগো লগে। আধা আধা ভাগাভাগি। তাতেই দেখবি, মাছের পাহাড় জইমা যাইবো দীঘির পাড়ে। সদরে চালান দিয়া বেচতে হইবো মণ কে মণ।'

'আধা দিমু ক্যান নানা? দীঘিটা কিনছেন না আপনে নায়েবের কাছ থন?'

'কিনছি ঠিক। কিন্তু ক এক ধাক্কায় পুরাটা দখল করতে চাইলে দেশের মানষে ক্ষেইপা যাইবো। বাপ দাদার জমানা থেইকা হেরা লাখেরাজ খাইছেনা দীঘির সব মাছ? খাজনা দিতে তো হয় নাই। এখন আমি পুরাটা পরথম দফায় দখল করলে দশ গেরামের মানুষ সব চইটা গিয়া লুটপাট কইরা নিবো না? মাইরা পিটা তাড়াইয়া দিবো না আমার জাইল্যা গরে?'

গেদু মামুদের যুক্তি তেমন মাথায় ঢোকে না তাইজ্যার। চুপ করে দেখতে থাকে। দীঘির চার পাড় ধরে ভিড় বাড়ছে। কতো সব মাছ ধরার যন্ত্র মানুষের। উত্তেজনায় ছুটে বেড়াচ্ছে ন্যাংটো ছেলেরা।

সারা দুপুর মাছ মারার পালা চললো মহা উৎসাহে। পলো, জাল আর মাছুয়াদের দাপাদাপিতে দীঘির স্বচ্ছ পানি দৈ দৈ হয়ে গেলো। কাদায় সাদা হয়ে গেছে ছেলে ছোকরাদের শরীর ঘোলা পানিতে ডুবিয়ে ডুবিয়ে।

এত মাছ। স্তূপের পর স্তূপ। খুশী মনে অর্ধেক দিয়ে গেলো লোকেরা। দুটো কাতলার একটা, দশটা শোল বোয়ালের পাঁচটা। ওতেই খুশী সবাই।

'নানা', খুত খুত করে তাইজ্যা. 'ইস অর্ধেক মাছ লইয়া গেলো ব্যাডারা জাইল্যা আইনা নিজেরা ধরাইলে পুরাটা থাকতো না আমাগো ?'

ক্রুর হাসি হাসে গেদু মাতবর, অর্ধেক মাছ নিয়াইতো পুরাটা দিয়া গেলো।'

'মানে ?'

'বুঝলিনা ?' আমারে মাছের খাজনা দিয়া দীঘির উপর আমার মালিকানা ষোল আনা স্বীকার কইরা লইলো দশ গেরামের মানুষ। এই বছর আধা, আগামী বছর সিকি, হের পরের বছর মামলা ডিসমিস। দীঘি অগ্রিম বন্দোবস্ত দিয়া দিমু চাড়াল গো কাছে। পাড়ের দুই শ' হাতের মধ্যে আইতে দিমুনা কোন বেডারে।'

পুরোপুরি বোঝেনা তাজু। বোকার মত হাসে, 'হ হ ঠিক কথা নানা।'

ভার বেঁধে কোরা কে কোরা মাছ আসে মাতবর বাড়ির উঠোনে। উৎসাহের সঙ্গে বাড়ির বৌঝিরা, নাতি নাতনীরা মাছ কুটতে বসে যায়। বেছে বেছে অনেকগুলো পাঠিয়েছে মাতবর আত্মীয় স্বজনদের বাড়ি, নিজের তিন শ্বশুরালয়ে, মেয়ে ও নাতনীদের শ্বশুর বাড়ি, সদরের নায়েব গোমস্তা সাহেব সুবা কেউ বাদ পড়েনি। চাড়াইল্যার দীঘিটা কব্জায় এসেছে—এ সুখবরটা সবাইকে জানানোও তো দরকার মাছ পাঠানোর উছিলায়।

হাতের আড়মোড়া ভাঙ্গে ফাতেমা বিবির মেয়ে যোবেদা, 'আর পারিনা গো ছোট মা। আমার ডানা দুইটা টনটনাইতে আছে।'

'কুট কুট যবি, হাঁজ হইবার আগে কাম শেষ করন চাই। আইজ আর ভাত খামুনা আমরা। হগলে মাছ বিরান খামু জান ভইরা।' বলে তারা বানু।

ফিক করে হেসে ওঠে মরিয়ম। বিয়ের ফুল ফুটেছে নাতনীর। বড় ঘরের বড় মেয়ের মেয়ে। বাড়িময় ওর আদরআত্তি। থাকবেই বা আর কতদিন নানা বাড়ি। পাত্রের সন্ধান করছে গেদু মাতবর। আট ক্লাস পাস এক ছেলের সন্ধান পেয়েছে। মান্দার বাজারে বাপের পিয়াজ রসুন সব কাঁচা মালের আড়ত। ছেলে নাকি নিজেই আলাদা ব্যবসা খুলবে বাপের থেকে পৃথক হয়ে। অনেক মূলধন লাগে তাতে। একখানা সাইকেল আর হাজার দশেক টাকা চেয়েছে ঘটকের মাধ্যমে। টাকাটাই যা বাধা। অত টাকা দিয়ে নাতনি পার করবে নাকি মাতবর? দর কসাকসি করছে ঘটকের সঙ্গে।

টিপ্পনি কাটে মরিয়ম, 'বেশী মাছ বিরান খাইওনা সাইজ্যা নানী। যত মোটা হইছো, নানায় তো আঞ্জায় বেড় পাইবোনা তোমার কোমর। তাল গাছের খাঁড়ি হইয়া উঠছো নানী খাইয়া খাইয়া।'

মরিয়মের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে আতরজান, 'এমনেই বাঞ্জা, আবার খায় হাতির খোরাক। মোটা হইবো না তো সাপলার লতা হইবো নাকি সাইজ্যা নানী।'

জোরে বলে, 'সাইজ্যা নানী, একটা পোলা পালক লও না ক্যান? বড় নানীর এগারোটা, মাইজ্যা নানীর সাতটা। তোমার কোলটা খালি। ইস—'

'দেখ আত্তি, সাইজ্যা সাইজ্যা কইবি না। আমারে ছোট নানী কইবি। আমার ছোট কোন সতিন আছে নাকি মাতবরের সংসারে যে সাইজ্যা কইবি আমারে?'

'নাই। হইবো। বিয়ার নেশা নানার। হের বাপ দাদা পর-দাদার মত বিয়ারোগ। তোমার বাঞ্জা যৈবন শেষ নানী। যেই ফুলা ফুলছো; নানার আর মন লইবো না তোমার মধ্যে। আইছিলা জামিরের মত চিকন মুখ লইয়া, এখন তোমার মুখ ভাদ্র মাইসা ইয়া বড় তাল। নানীর দুধ দুইটা—'

বলেই জিভ কাটে মরিয়ম। একটু থেমে বলে, 'কইয়া দিলাম. নানায় আরেকটা সাঙ্গা করবো। এইবার ছোট নানী আনবো জালি লাউয়ের লাহান কচি দেইখা। ঝুনা নারিকেলে মন নাই নানাজানের, জোড়া কচি ডাব চাই বুড়ার।'

বাকীটুকু যোগ দেয় আতরজান, 'হ নানী ঠিক কইছে মরিয়ম বু। নানায় আরেকখান আটচালা বানাইবো, হেই দিন কইতে আছিলো হাশেম মিয়ারে। বুঝলানা সাইজ্যা নানী, ছোট বিবির লাইগা আলাদা দালান কোঠা চাই।'

'আলাদা ঘর আর নতুন বিবি দিয়া কি হইবো নানার?' 'খিলখিল করে হাসে মরিয়ম, 'কামড়াইবো কি দিয়া। নানার দাঁত তো অর্ধেক ফৌত হইয়া গেছে।'

ছয়

আকাশ ভরে জ্যোৎস্নার ধারা নেমেছে। টুকরো টুকরো সাদা মেঘের ফাঁকে পূর্ণিমার গোলাকার চাঁদ সাঁতার কাটছে যেন দূর নদীর দিকে। বাতাসে হিমের আভাস।

ভেতর বাড়িতে রাতের খাবার দাবার শেষ। উঠোনে জটলা ছোট ছেলে মেয়েদের। জোনাকীর পেছন তাড়া করছে ওরা। ধরে কুমড়োর ডাঁটার খোলে আটকাবে পোকাগুলোকে।

চাটাই পেতে ছোটদের মাঝে বসে তারা বানু। শূন্য আট চালা ঘরে মন টেকে না। গেদু মাতবর আজকাল আর আনন্দ খুঁজে পায় না ওর শরীরে। খেয়ে দেয়ে হুঁকোটা টানতে টানতে বাংলা ঘরে নেমে যায়। সেখানে কাশির ধকল উঠলে বুকে পিঠে মালিশ করে দেয় হাসেম আর তাইজ্যা। মাথায় বাতাস করে তালের পাখা দিয়ে।

ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে মালিশ লাগায় ওরা। সারাদিনের একটানা খাটুনির পর চোখ ফেটে ঘুম আসে।

'ও হাইস্যা, জোরে জোরে চালাস না পাঙখা। ঝিমাইতে আছস ক্যান মড়কি রোগে ধরা মুরগীর লাহান?'

হুশ নেই হাসেমের। মাতবরের পায়ের কাছে পা ঝুলিয়ে দিয়ে বসা অবস্থায় ঘমিয়ে পড়েছে ও।

এক সময় পা টিপে টিপে কাচারীর উঠোনে নেমে আসে তাইজ্যা। চোখ মেলে দূর তাল বনের দিকে চেয়ে থাকে। জ্যোৎস্না গলছে বন জুড়ে।

মান্দারের হাট থেকে একটা মুলি বাঁশের বাঁশী কিনেছে। পাঁচ সিকার বাঁশী। কিন্তু কি তার বোল! বাজাতে গিয়ে নিজেই তন্ময় হয়ে শোনে বাঁশীর মোহন সুর।

টের পায়নি তাজু, কখন উঠোনে ছেলেমেয়েদের মেলা ছেড়ে নিঃশব্দে খড়ের পারার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে আতরজান। নির্বাক চোখে তাকিয়ে আছে ওর মুখের দিকে।

এক সময় সুরের ঘোর কাটে তাইজ্যার। চোখ মেলে আতরজানকে দেখে চমকে ওঠে।

'আরে আত্তি দেখি? কই যাস তুই?'

'কই যামু আবার। তোমার বাঁশী শুইনা দেখতে আইলাম। বাড়িতে বইসাই এত মজা কইরা বাজাও. চাড়াইল্যার দীঘির পাড়ে গিয়া বাজাইলে কইলাম গাছ গাছড়া থন পক্ষীরা সব নাইমা আইবো।'

'পক্ষী ক্যান। তাজু মিয়ার বাঁশীর সুরে আসমানের চান্দও নাইমা আইবো।

'হ চান্দ নাইমা আইবো। তোমার যত উল্টা পাল্টা কথা।'

'আতরজান বিবি যদি ঘর ছাইড়া নাইমা আইতে পারে কাচারীর উঠানে, চাঁদনী আইবোনা ক্যান। যাত্রা পার্টিতে যদি নাম লেখাই—'

'কি হইবো? সোনাভান তোমার গলায় মালা পরাইয়া দিবো? সানক সাপের মত নাচবো তোর বাঁশীর সুরে সুরে?'

'সাপে না নাচুক, তুই তো নাইচা নাইচা কাছে চইলা আইলি।'

'আইলাম কই। যাইতে আছি। বড় নানী দেখলে পিঠে বেত লাগাইবো। আইজ কাইল আমারে দেখতে পারেনা একদম।'

'ক্যান?'

'কয় আমার শরীরটা নাকি শনি। যৈবনের হাবিয়া দোজখ নাকি আমার গতর।'

'কইবার দে।' জ্যোৎস্নায় দারুণ মোহনীয় মনে হয় আতর-জানকে, 'বুড়ির গতরে এখন আর থুকও ফালায় না মাতবর নানা। একবার ফিরাও তাকায় না মুখের দিকে। আদর কইরা কয়ও না, 'ও মজুর মা, গেলা কই, এক খিলি পান সাইজা দাও দেখি।'

ভাবালু চোখে তাকায় তাজু. 'মাতবরে আরেকটা বিয়ার তালে আছে। উত্তর ভিটার আট চালাটা শেষ হইলেই নিকা করবো, কইয়া দিলাম।'

'ধ্যেৎ। মজু মামুর লাইগ্যা ঘর বানাইতে আছে।' খিল খিল করে হাসে আতরজান, 'না, তোমার লাইগা বানাইতে আছে। তাজল ইসলাম মিয়ার লাইগা নাতবৌ আনবো বুড়া। পাতিলের তলার লাহান কালা বউ, বুঝলা?'

বলেই ভেতর বাড়ীর দিকে উধাও হয়ে যায়।

জ্যোৎস্নায় যেন ঢেউ তোলে আতরজানের পলায়মান শরীর। ওর জোড়া নিতম্ব শাড়ির বাঁধন মানতে চায়না যেন। উদাসীনভাবে মনে মনে বলে তাইজ্যা, 'শনি তুই, বড় নানী ঠিকই কইছে, তোর গতরটা একটা হাবিয়া দোজখ, আগুন ধরাইয়া দেয় মানষের চোখে।'

বড় নানী মাইজ্যা নানী আর সাইজ্যা নানীর জন্য বড় মায়া হয় তাইজ্যার। ওদের চোখের সামনেই তো বড় হয়েছে ও। নতুন নতুন কি আদর আত্তি ছিলো একেকজনের। রাজ-রানীর মত পালঙ্কে বসিয়ে রেখেছে প্রথম প্রথম গেদু মাতবর। মৌমাছির মত ভন্‌ভন্‌ করেছে চারপাশে দিনরাত। হাটে গিয়ে জোড়া জোড়া শাড়ি কিনে এনেছে।

আর এখন? বড় নানীকে বাদ দিয়ে মেজোটাকে কি খোশামোদ তোষামোদ করলো নানা তিন চার বছর। ওর ঘরে কাটালো দিনরাত ঝাপ দরজা বন্ধ করে। মহালের কাজকর্মে কোন দিশ ছিলো না নানার। মেজোর রূপের মধ্যে দেওয়ানা হয়ে রইলো। সেঁটে রইলো ফাতেমা বিবির আঁচলের নীচে আদেখলার মত।

বাঁজা তারা বিবির ভরা গাংয়ের মত তাজা শরীর দেখে তাজু মিয়ার ভেতরটাও মোচড় দিয়ে উঠেছিলো। কি পাছারে বাবা! জোড়া জলকদু যেন তারা নানীর নিতম্ব দুটো। বদনা হাতে নানী যখন পগারে যেতো গাছগাছালির সরু পথ ধরে, ইচ্ছে করতো তাজুর—। কি ইচ্ছে করতো, ভাবতে গিয়ে গলা শুকিয়ে যেতো। ইস্‌ তারা বিবি যদি কোনদিন বলতো আদর করে, 'ওই তাইজ্যা, গাছে উইঠা এক জোড়া কচি ডাব পাইড়া দেতো সোন, বড় পিয়াস পাইছে, তাজু বলতো, তোমার কচি ডাব জোড়া যদি এক নজর দেখবার দাও নানী, তয় দুইটা ডাব ক্যান, পগারের সব ডাব কাইটা আইনা থুপ দিয়া দিমু উঠানে।'

আহা রে! সে তারা বানুও শেষ হয়ে গেলো। বড় আর মেজো শেষ হয়ে গেলো বছর বছর বাচ্চা পয়দা করে। হাড্ডির ওপর চামড়ার আস্তর ছাড়া নেই কিছু ওদের। বড়টার চুল বারো আনা গেছে পেকে, মেজোটার অর্ধেক গেছে পড়ে। তারা বানুটা ভাল খাওন পেয়ে ফুলতে ফুলতে হাতি হয়ে উঠেছে। বাঁজা মেয়েলোক ফুলবে না তো কি? মান্দার বাজার স্কুলে ছেলেরা ফুটবল খেলে না? সে ফুটবলের মত গোলাকার এখন সাইজ্যা নানী। বুকের ওপরও দুটো ঝুলন্ত ফুটবল। দেখে সুখ পায় না তাইজ্যা। জোয়ান ছেলে তাইজ্যারই যদি দেখতে ইচ্ছে না করে মুটকি তারা বিবিকে, মাতবরের চোখে উৎসাহ আসবে কোথেকে? বেচারীর জীনের পয়দা একটা ছেলে কি মেয়েও যদি থাকতো

তারার, মাটি কামড়ে পড়ে থাকতো এ বাড়ীতে। সত্যি বাঁজা মেয়েলোকের জীবনের কোন অর্থ নেই, কোন স্নেহের অবলম্বন নেই। দার্শনিকের মত ভাবে তাইজ্যা খড়ের গাদায় পিঠ এলিয়ে দিয়ে।

'তাজু ভাই!'

আবার আতরজান। চমকে উঠে পিঠ সোজা করে তাইজ্যা।

'এই লও, তাজু ভাই। খেতের উপর শুইয়া আছো ক্যান, পিঠে চুলকাইবো না?' একটা চিকন করে বোনা চাটাই এগিয়ে দেয় আত্তি, এইটা বিছাইয়া শোও কাচারি ঘরে গিয়া।'

'চাটাই! কই পাইলি?' চাঁদের আলোয় মেলে ধরে তাইজ্যা। কালো আর সাদার বুনট—একজোড়া ময়ূর পাখী মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ঠোঁটের কাছে ঠোঁট ধরে রয়েছে। অপূর্ব ঠাট ওদের শরীরে। অবাক হয়ে বলে আবার, 'কই পাইলি?'

'তোমার লাইগা বুনছি। তুমি বাঁশ কাইটা দিছিলা না। একটা তোমার লাইগা বানাইলাম। সরমে দেই নাই এতদিন। তুমি যদি না নেও। যদি কও, পচা হইছে।'

দেখে খুশী হয় তাজু। চোখের সামনে মেলে রাখে।

'শুইবা ভাবী জানেরে লইয়া আর আমার কথা মনে করবা। কেমন?'

বলতে বলতে চোখ জোড়া কোমল হয়ে ওঠে আত্তির। ওপরের আকাশে গোলাকার চাঁদ দেখে। ভাবালুভাবে বলে, 'নানায় সেদিন বড় নানীরে কইলো, তাইজ্যাটা পালোয়ান হইয়া উঠছে, ভিতর বাড়িতে মাইয়া ছেইলা গো সামনে ওইটারে আর আসতে দেওন ঠিক না। বিয়া দিয়া চাড়াইল্যার দীঘির পাড়ে মাচান উঠাইয়া পার কইরা দিমু। দীঘির মাছ পাহারা দিবো আর পাড়ে কাওন ধানের চাষ করবো। বিশ্বাসী পোলা, সয়সম্পত্তি লইয়া খেয়ানতি করে নাই কোন দিন।'

বিয়ের কথার উল্লেখে চোখ জোড়া চকচক করে ওঠে তাইজ্যার, 'মাইয়া ঠিক করছে? কই, আমারে তো কিছু কয় নাই নানা।'

'তোমারে কয় নাই, আমারে কইছে কানে কানে।'

'ওই ফাজলামি করস কন? ক'না কেটা?' উৎসাহে ঘনিষ্ঠ হয়ে আসে তাইজ্যা।

গাছ নৌকার পাটাতনের মত শক্ত ওর চওড়া বুক। খোলা বুকে

কালো কর্কশ লোমের জঙ্গল। সেখানটায় গাঢ় চোখে তাকায় আতরজান। চুপ করে থাকে। বাতাসে যেন তাজুর গায়ের বুনো গন্ধ।

'কই কইলি না, নানায় কই বিয়া ঠিক করছে আমার?'

'কমু না।' কোমর নাচায় আত্তি, 'তুমি একটা বন মানুষ তাজু ভাই, তোমার শরীলে কততো লোম রে বাবা। একটা দোচালা ঘর ছানি দেওন যাইবো তোমার বুকের কালা পশম দিয়া। পাহাড়ের জঙ্গল থন একটা লোমওয়ালা মাদী বান্দর আনবো মাতবর নানা। তোমার গলায় ঝুইলা থাকবো বান্দরের মালা।'

'তোর লাইগা তয় আমিও একটা—'কি একটা বর আনবে তাইজ্যা আত্তির জন্য, ঠিকমত বলতে পারেনা তখন তখন।

'আইনো একটা লেংড়া লুলা আন্ধা বয়রা বোবা কালা দাঁতপড়া বুইড়া। খুককুর খুককুর ক্ষয়কাশওয়ালা বুড়ো।' হঠাৎ গম্ভীর হয়ে ওঠে আতরজানের স্বর, 'বান্দী খাটি পরের বাড়ি, আমার কপালে কি আর ইসুব বাদশা আছে নাকি তাজুভাই?'

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে আতরজান। কাচারি ঘরের পেছনে একটা তক্ষক ডেকে ওঠে থেকে থেকে। ঝিঝি পোকার একটানা শব্দ আসে ঝোপ ঝাড় থেকে।

উদাস ভাবে বলে এক সময়, 'তাজুভাই, আমারে একদিন চাড়াই-ল্যার দীঘি দেখাইতে নিয়া যাইবা?'

'তুই মাইয়া ছেইলা বিরানা ছাড়া বাড়িটাতে গিয়া কি করবি?'

'ক্যান? গেলে কি হয়? দীঘির টলটল পানি দেখুম।'

'না। ওই খানে যায়না মাইয়া মানুষ। দীঘির পাড়ে একটা তেতই গাছ আছে না? ওইটার আগায় ভূত থাকে।'

দূর! ভূত থাকবো ক্যান গাছে?'

'তুই কিচ্ছু জানসনা। তেতই গাছে ভুতপেত্নীর বাসা। তাও আবার ছাড়া দীঘির পাড়ে গাছ। তোমারে লইয়া যাই আর—'

দম নিয়ে বলে, 'আর ভুতে ভর করুক তোমার সোন্দর শরীলের উপর। জানসনা, সাইজ্যা নানীর লগে ভুত আছে। হেই লাইগা আইজ এতটা বচ্ছর কোন বাল বাচ্চা হইলো না তারা বানুর। বেচারী! নানীটারে রোজ রাইতে ভুতে চাপে।'

'তা হইলে জাইনা শুইনা মাতবর নানায় ক্যান হেরে বিয়া করলো ?' চোখ বড় বড় করে তাকায় আতরজান। একটু থেমে বলে, 'তুমি ঠিক কথাই কইছো তাজু ভাই। আমি না একদিন তারাবানুর লগের ভুতটা দেখছি। আস্ত মানুষের সুরত ধইরা—'

'কি কইলি ? হাচা হাচা দেখছস ?'

'হ। ঠিক আমগো হাসেম ভাইর মত। আন্ধার রাইতে আমি টাট্টিতে যাইতে আছিলাম। দেখি কি, সাইজ্যা নানী ডেউয়া গাছটার তলায় খাড়াইয়া রইছে আর হেরে জাবড়াইয়া ধইরা—'

'ও সেই কথা ? সেই ভুতটা তো আমিও দেখছি।' হেসে ওঠে তাইজ্যা, 'হাইশ্যার লগে নতুন পীরিত তারা নানীর। হাটের তন হাইশ্যা নানার সরিষা বেচা টেকা চুরি কইরা নানীর লাইগা সোনো পাউডার পুঁতি এইসব কিনা আনে। হাইশ্যা কয়, 'নানারে হাঁপানির বিমারীয়ে ধরছে আর বেশী দিন হায়াত নাই বুড়ার।'

'তয় ?'

'বুড়া মরলে হাইশ্যা তারারে নিকা করবো।'

'তোমার পেটে এততো খবর! কওনাই তো কোনদিন।'

'খারাপ কথা কইতে নাই। আমার পেটে বহুত কথা আছে এই বাড়ির। পেটে পেটেই রাখি।'

'তা হইলে', ভাবে আতরজান, 'হাসেম ভাইর বাড়িতে যে বউ আছে, হেইটার কি হইবো ?

'কি হইবো ? হেইটারে বাইন তালাক দিয়া দিবো। দুই বিবি পোষনের মুরদ কই হাইশ্যার ? হে তো আর ইসব মাতবরের পুত গেদু মাতবর না। মাঠে তো হাইশ্যার এক হাতও শাইল জমিন নাই।'

হঠাৎ যেন ভেতর বাড়ির উঠোনে গেদু মামুদের সাড়া পায় ওরা। বুড়া খকর খকর শব্দে কাশতে কাশতে বেরিয়ে আসছে কাচারি ঘরের দিকে।

'কেটা রে ওইখানে ?'

'আমি তাজুল ইসলাম নানা।'

'কি করস এত রাইতে জাইগা জাইগা? কার লগে কথা কইতে আসছ ?'

'চাদনী দেখি নানা। দেখছেন কি সোন্দর চান্দ উঠছে আসমানে। কথা? নিজের লগে কথা কইতে আছি। আসমানে চান্দ দেখলে নিজের লগে কথা কইতে মন চায় নানা।'

'হ তাজল ইসলাম মিয়া, যোয়ান কালে চক্ষে চাদনী দেইখা বিছানায় মন টেকে না। আমাগোও মন টিকতো না, চান্দ দেখলে বুকের ভিতর উথাল পাথাল করতো সাগরের লাহান। আর এখন—'

বলেই কাশতে শুরু করে গেদু মামুদ।

'দে তো নাতি বুকটা একটু মালিশ কইরা। তোর নানী গো হাতে জোর নাই, হে গো খেদমতে আরাম পাইনা। খেদমত করেওনা আইজ-কাল। হগল ইয়া নফসি ইয়া নফসি—'

'বসেন নানা।' বলেই আতরজানের দেওয়া চাটাইটা পেতে দেয় খড়ের ওপর।

'না আমি শুই। লম্বা হইয়া শুই।'

'একটা বালিশ আনুম?'

'বালিশ লাগবোনা। এমনিই শুই হাতের উপর ঠেস দিয়া।'

মাতবরের বুক ঘসাতে থাকে তাইজ্যা পাশে বসে। এক সময় বলে, 'মজু মামুরে বিয়া দিবেন না? বয়স হইছে না মামুর?'

'আমি বিয়া দিবার কেডা? বাড়িতে আসে হারামজাদা? বাজারে বন্দরে খানকী লইয়া ফুর্তি করে। বাপের টাকা উড়ায় দুই হাতে। বড় পুত বংশের বাত্তি আমার হগল আশা নিভাইয়া দিছে মইজ্যা। দেখবি খানকী বিয়া কইরা ঘরে আইনা তুলবো একদিন।'

উত্তেজনায় উঠে বসে বুড়ো, 'হে রে আমি ত্যাজ্য পুত্র করুম, ত্যাজ্য পুত্র করুম কইয়া দিলাম।'

সাত

'তাজু ভাই তাজু ভাই। শুনছো?'

কাচারী ঘরের বেড়ায় মৃদু টোকা দেয় আতরজান বাইরে থেকে।

দুপুরে এক পেট ভাত খেয়ে কাচারির কাঁচা শীতল মেঝেতে আতরজানের দেওয়া চাটাইয়ে শুয়ে জিরাচ্ছিলো তাইজ্যা। চোখ মাত্র লেগে এসেছে ঘুমে।

'কি? কি হইছে?'

'বাইরে উইঠা আসো। পগারের দিকে কেন্দা গাছটার তলায় আসো। কথা আছে!'

বলেই পগারের জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে যায় আতরজান। পেছন পেছন বেরিয়ে আসে তাইজ্যা। কৌতুহলের চোটে ঘুম কেটে গেছে।

'শুনছো মজার কথা?'

'কি কথা? ক।'

দারুণ কথা। দারুণ মজার কথা। দেখো দেখি, কইবার পারো নাকি?'

'কি? বুঝছি। মাতবর আরেকটা নিকা করবো। ঠিক না?'

'দূর। এইটা বুঝি মজার কথা হইলো। নিকা করবো—মজার কি হইলো?'

'তয়? পারলামনা। তুই কইয়া ফালা।'

'পারলানা?' কবুতরের মত ক্ষীণ পায়ে নাচতে থাকে যেন আতি, 'পোলা হইবো। তারা নানীর পোলা হইবো। নানায় যা খুশী না?'

'কস কি? এতো বছর পরে? বাঁজা বেটির পেট লাগছে?'

'হ। নানী খালী চুকা খায়। হাইশ্যারে দিয়া চাড়াইল্যার দীঘির পাড়ে যে তেতই গাছটা আছে, হেইটা থন এক বস্তা তেতই আনাইছে পাড়াইয়া। বাটি বাটি আচার গিলতে আছে। আর ওয়াক ওয়াক—'

বমি করার মত মুখ বানায় আতরজান।

'নানায় যা খুশী না তারা নানীর উপর। নাম ও ঠিক কইরা ফালাইছে। হাইসা হাইসা কয় সাইজ্যা নানীরে, পোলা বিয়াইলে নাম রাখুম সদর আলী মাতবর, ডাক নাম সদু। গেদু মাতবরের পুত্র সদু মাতবর।'

নখ দিয়ে কেন্দা গাছের বাকল খোটে আত্তি, 'তারা বানুয় কইলো' আর মাতবর সাব, যদি মাইয়া হয় তখন?'

'না মাইয়া হইবো না, পুত হইবো তোর।'

স্বগতোক্তি করে তাইজ্যা, 'কলি কাল রে আত্তি। কলিকালে কত কিছু দেখলাম মাতবর বাড়ি। কাউয়ার বাসায় কোকিলার ছা. আন্ধা কাউয়া চেনে না।'

'মানে?'

'মানে বুঝলি না? গেদু মাতবরের পোলার নাম সদু মাতবর না হইয়া কাইশ্যা হওন দরকার। হাইশ্যার পুত কাইশ্যা। আবুল হাশেমের পুত্র আবুল কাশেম।'

'কি কও তুমি?' ঘনিষ্ঠ হয়ে আসে আতরজান, 'তারা বানুর পেটে হাইশ্যার ছাওয়াল?'

'তয় কি আমার ছাওয়াল কইবার চাস তুই? গেদু মামুদের কি আর বুড়া কালে ক্ষেমতা আছে নানীরে ভরট করনের? তারা নানী হাইশ্যার লগে চুরি কইরা যেই রকম ফুসুর ফাসুর করতে আছিলো, তখনই বুঝছি আমি, কাম ফতে—'

'হ ঠিক কইছো তাজু ভাই। বাইরে যতো হামকি তামকি বুড়ার. কামের বেলায় ঢোঁ ঢোঁ। হাইশ্যার লাইগা কি আদর তারা নানীর। হেরে লুকাইয়া লুকাইয়া আণ্ডা ভাইজা খাওয়ায়. লুঙ্গি কিননের লাইগা টেকা দেয় আর খালি মিটমিটাইয়া চায় হের দিকে। ডেউয়া গাছের তলায় দেইখা তো ভাবছিলাম, ভুতটা বুঝি হাইশ্যার সুরত ধইরা নানীরে—এখন দেখি—।'

উঁচু কাঁঠাল কাঠের খড়ম পায়ে গেদু মাতবরের। ঘোড়ার মত হাঁটু দাবড়াতে থাকে মাটিতে। ঘোলা চোখ দুটো যেন আগুনের গোলা।

'মইজ্যার মা, হুনছো তোমার পোলার কারবার। ঘরে শুইয়া শুইয়া

পান সুপারি পারে চিবাইও। আগে দেইখা যাও কি সর্বনাশ হইছে। মাতবর বাড়ীর মুখে মুইতা দিছে তোমার পোলা। তোমার বড় লবাবজাদা।'

হন্তদন্ত হয়ে ঘরের বাইরে ছুটে আসে বড় বিবি, 'কি কন? কি হইছে? কি করছে মজু?'

'কি করছে? সাঙ্গা করছে। গোলামের বাচ্চা যাত্রা পার্টির ছিনাল নাচনেওয়ালীরে কবুল করছে। বুঝলা, বেশ্যারে পুতের বউ বানাইয়া আনতে আছে তোমার লাইগা।'

উঠোনের এমাথা ওমাথায় চক্কর খেতে থাকে মাতবর। এত ক্রোধ ওর আগে কখনো দেখেনি বাড়ী ভর্তি ছেলে মেয়ে, নাতি নাতনী আর কাজের বেটাবেটিরা। জটলা করে সবাই চার পাশে।

সুপারি কাটার সোর্তা হাতে শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে থাকে মজিদের মা। গেঁটে বাতের রোগী। এমনিতেই বুকে ধড়ফড়ানি। তার ওপর ছেলের কীর্তি শুনে মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে যায় মরা লাশের মত।

'এতদিন এমনি এমনি কইছিলাম মইজ্যারে ত্যাজ্যপুত্র করুম। এইবার হাচা হাচাই কুত্তার বাচ্চারে ত্যাজ্য করুম। সদরে গিয়া হাকিমের সামনে দলিল কইরা দিমু, আমার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির এক কানাকড়িও পাইবো না হারামজাদা।'

চোক গিলে বুড়ো। আবার চিৎকার করতে থাকে, 'আমার বাপ, দাদা পরদাদার বাপ সাতটা আটটা দশটা বিয়া করছে, একটা মরলে আরেকটা করছে, একটারে তালাক দিয়া আরেকটারে কবুল কইরা ঘরে আনছে। কিন্তু এমন কেলেঙ্কারী তো করে নাই কোনদিন। বাজাইরা মাইয়ালোক রে ঘরে আইনা তোলে নাই।'

ভয়ে ভয়ে কম্পিত স্বরে বলে মজিদের মা, 'তয় কই এখন হেরা? কই আছে মজু এখন?

'কই আছে? আমি দারোগা পুলিশ নাকি যে কইয়া দিতে পারুম কই আছে তোমার দুলাল? তোমার কলিজার টুকরা আবদুল মজিদ মিয়া?'

'ত্যাইজ্যা ও ত্যাইজ্যা, হাঁক ছাড়ে মাতবর, 'পানি আন আমার লাইগা। গাছে উইঠা কচি ডাব পাইড়া আন। মাথার তালুদিয়া দোজখের আগুন বাইর হইতে আছে আমার।'

গর্জন করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যায় গেদু মাতবর। শেষটায় ঘরে উঠে যায়। সটান চৌকিতে শুয়ে পড়ে। ওপরের দিকে চেয়ে কড়িকাঠ দেখে।

মেজাজের ভাপা যখন কমে আসে, তখন নীচু স্বরে ডাকে, 'ও হাইশ্যা, তামুক আন।'

হাশেম বাড়ি নেই। এক জোড়া কবুতরের বাচ্চা নিয়ে গেছে মসজিদের ইমাম সাহেবের বাড়ি। ইমামের তাবিজের বরকতে গর্ভবতী হয়েছে তারা বিবি। কৃতজ্ঞতার নির্দশন স্বরূপ তারা ভেট পাঠিয়েছে ঘরের পোষা কবুতর।

তামাক সাজিয়ে ঘরে এসে ঢোকে আতরজান, 'নানাজী, হাসেম ভাই বাড়ি নাই। পান খাইবেন লগে?'

হুঁকোটা টেনে নেয় মাতবর। উঠে বসে বিছানার ওপর।

'হ খামু। সাদা দিবি বেশী কইরা।' গাম্ভীর্যের মেঘ কেটে গেছে তামাকের গন্ধ পেয়ে।

'মাইজ্যা নানীর কৌটায় খুশবুদার কিমাম আছে। হের ভাই বেড়াইতে আইসা দিয়া গেছে। কিমাম খাইবেন? খুব কড়া মিঠা।'

বলেই হা করে নিশ্বাস ছাড়ে মুখ দিয়ে আতরজান। মাতবরের নাকের কাছাকাছি। পান চিবোচ্ছে ও। মিষ্টি জরদা কিমামের সুগন্ধ ওর মুখে।

'না। এখন কিছু খামুনা।' এতক্ষণ পর রাগ পড়ে আসে মাতবরের। চোখের আগুনে দৃষ্টি কোমল হয়ে আসে। আপাদমস্তক দেখে আতরজানকে।

মুখে পান। গাল ফুলিয়ে হুঁকোয় টান মারে মাতবর। হুঁকোর ভেতর না বুকের ভেতর গড়গড় শব্দ হয় ওর, ঠিক ধরতে পারেনা আতরজান।

'যাই নানা। সাইজ্যা নানীর লাইগা হিদল সুটকির ভর্তা পিশুম পাটায়। হিদলের ভর্তা খাওনের সখ হইছে নানীর। বয়স কালের হামেলা তো, কততো কিছু খাইতে ইচ্ছা করে।'

'যাবি ক্যান?' চোখ বড় বড় করে তাকায় মাতবর, চিল্লাচিল্লি কইরা বড় মাথা ধরছে আমার।'

'গরমে মাথা ধরছে? ডাবের পানি খাইবেন? তাজুভাইরে কই গিয়া ডাব পাইড়া দিতে।'

'না না ডাব ডুব খামুনা। তুই একটু মাথাটা টিপা দে।'

বলেই সটান শুয়ে পড়ে গেদু মামুদ, 'দে। মাথার কাছে বইসা লায় লায় দে। আমি একটু ঘুমামু।'

জড়োসড়ো হয়ে মাতবরের বিছানায় বসে আতরজান। দু'হাতের আঙ্গুল দিয়ে মৃদুভাবে টিপতে থাকে মাতবরের কপালের দু'পাশ।

আরাম পেয়ে হাল ফেরত বলদের মত চোখ বুজে থাকে মাতবর। এক সময় বলে, 'আতু তোর হাতে মধু আছে। দুই টিপা দিছস্। মাথার বিষ অর্ধেক কইমা গেছে। তোর নানী গো আঙ্গুল লোহার শলার লাহান শক্ত, একটুও আরাম পাইনা। টেপেনা, খামচায় হেরা। পারলে খামচাইয়া খামচাইয়া আমার মস্তকের চামড়া উঠাইয়া ফালাইবার চায়।'

এই প্রথম আতরজানকে আদর করে নরম স্বরে মাতবর আতু বলে ডাকে। এ ভাবে তো কেউ কোনদিন ডাকেনি। হয় আতরজান, না হয় আত্তি। তাজু ভাইও তো ওকে আতু বলে সম্বোধন করেনি কখনো। ভাবে মনে মনে, ছোট্ট হলেও সুন্দর ডাকনাম।

ঘাটের পথে চেপে ধরে মরিয়ম, 'কি লা আত্তি, নানাজানের ঘরে কি অতো ফুসুর ফাসুর করতে আছিলি এতক্ষন?

বলেই চোখ টিপে হাসে। মৃদু চিমটি কাটে ওর ডানায়।

'নানার মাথা ধরছিলো—'

'বুড়ার মাথায় ধরছিলো, আর বুড়া তোরে ধরছে।' আতরজানের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে মরিয়ম, 'বেশী ঘনাইসনা মাইয়া, তোর উপর না আবার চড়া হয় বুড়া। বুড়ার হাড্ডিতে এখনো বহুত রস।'

'চড়া হইবো কেমনে? আমি দিলে তো?' গেদু মামুদের পক্ষ নিয়ে বলে আতর, 'নানায় ভালা মানুষ, খারাপ কথা কও ক্যান হের নামে?'

'খারাপ কথা কইলাম কই? কি মধুর মধুর কথা কইতে আছিলো তোর লগে সারা দুপর? দেখিস আত্তি, তোর মধু নি আবার চাইয়া বসে বজ্জাত বুড়ায়।'

বলেই আতরজানের শাড়ির নীচে ঠেলে ওঠা স্তনদ্বয়ের ওপর টোকা দেয়।

'চাক দুইটা তোর এখন মিঠা মধুয় টই টই করতে আছে। বুড়ায় দুই চিপা দিলে দুই গামলা রস নামাইবার পারবো।'

শরম পেয়ে বুকের ওপর শাড়ি ভাল করে টেনে দেয় আতরজান। ঘাড় নত করে নিজের সম্মুখ দেখে। সত্যি দিনে দিনে ভরে উঠছে বুক দুটো। ব্লাউজে বেঁধে রাখতে পারেনা। ভারী লজ্জা করে ঢেঁকিতে উঠে পাড় দিতে, ঢেঁকির তালে তালে নাচে ও দুটো। কখনো বামে হেলে পড়ে, কখনো ডানে। ইচ্ছে করে, গামছা দিয়ে শক্ত করে বেঁধে নেয় পিঠের সঙ্গে, যাতে আর লাফাতে না পারে পাড় দেওয়ার তালে তালে।

'আমার গতর দেইখাই এতো কথা কও মরিয়ম বিবি, তোমার সাইজ্যা নানীরে দেখছো? কেমন সোন্দর হইয়া উঠছে হামেলা হইয়া। কয়দিন পর তোমার গেদা মামু জন্মাইলে'—বলতে বলতে হাসিতে মরিয়মের ওপর হেলে পড়ে আতি।

'ঠিক কইছস তুই। বুড়া কালের পোলা নানার, কইয়া না দিলে মানষে হের নাতি মনে কইরা বসবো।'

দাঁতের নীচে চিবিয়ে চিবিয়ে বলে আতরজান, 'নানার পোলা না কইয়া নানীর পোলা কও। কাউয়ার বাসায় কোকিলার ছা।'

কথাটা শুনতে পায় না মরিয়ম। ততক্ষণে পুকুর ঘাটের শেষ ধাপে নেমে গেছে দু'জন।

আট

কাচারি ঘরের সামনে হাতলভাঙ্গা চেয়ারে বসে গেদু মামুদ। থম-থমে আষাঢ়ে মুখ। হুঁকোটা সাজিয়ে পাশে রেখে দিয়েছে তাইজ্যা। দুপুরের রোদ তেতে উঠছে মাথার ওপর। গ্রামের পাঠশালা ছুটি হয়েছে। সমবেত কণ্ঠে নামতা আওড়াতে আওড়াতে বাড়ি ফিরছে মাতবরের ছোট ছেলে মেয়ে আর নাতি নাতনিরা। সবগুলো নাতি নাতনি মেয়ে পক্ষের। মজিদটা বিয়ে করলোনা। ওর ছোট যে তিনটা ছেলের বিয়ে দিয়েছে, একটাও বাপের বাড়ি থাকেনা। তিনটাই আলাদা বাড়ি বানিয়ে সরে গেছে। নতুন গেরস্তালি পেতেছে নিজের নিজের। আপত্তি করেনি গেদু মাতবর। এক বাড়িতে টাকি মাছের পোনার মত গিজ গিজ না করে ছড়িয়ে পড়া ভাল। কুরকুরু মামুদের আওলাদ ফরজন্দ যত ছড়ায় তত ভাল। বংশের নাম ডাক বাড়ে তাতে। জমিজিরাতের তদারকি হয় বেশি।

'তাইজ্যা। তাজু মিয়া।'

'কি নানা। চিলিম বদলাইয়া দিমু? টানেন নাই তো একবারও। তামাক তো পুইড়া শেষ হইয়া গেছে।'

'না। হাইশ্যারে ডাক।'

চত্বরের মাথায় লম্বা বাঁশ বেঁধে ওতে শুকনো পাট নতুন করে শুকোচ্ছিলো হাসেম। লম্বা লম্বা দশ বারো হাত সোনালি আঁশ। জাঁক দেওয়া ছিলো গুদাম ঘরে। এ বছর পাটের ফলন ভাল। পাঁচ শ মণের বেশী পেয়েছে মাতবর। বেপারিরা গাছ নৌকো নিয়ে এসে ঘোরা ঘুরি দরাদরি করেছে। ছাড়েনি মাতবর। দাম বাড়ুক। আশ্বিন কার্তিক মাস থেকে দাম তেজী হয়ে ওঠে। শীতের মাথায় সবচেয়ে বাড়ে।

হাসেমের হাতে পাটের গন্ধ। লুঙ্গির প্রান্তে হাত মুছে সামনে এসে দাঁড়ায়। মাথায় ঘাম ঝরছে গরমে।

'নানা।' কপালের ঘাম মোছে হাইশ্যা।

'তাজু মিয়া আর হাসেম মিয়া কাইল ফরিদপুর যাইবা। ভোরের ট্রেনে।'

পরবর্তী আদেশের জন্য অপেক্ষা করে দু'জন।

'সেখানে রূপসুন্দরী অপেরা পাটিতে মইজ্যা—আমার বড় পুত্র আব্দুল মজিদ মিয়া যাত্রার অভিনয় করতে আছেন। তারে দুই জনে দুই কানে ধইরা টানতে টানতে সোজা বাড়ি নিয়া আসবা।'

'যদি না আসে নানা।' চুল চুলকায় তাইজ্যা।

'না আসতে চাইলে দড়ি দিয়া বাইন্ধা বেতাইতে বেতাইতে—'

'হে না বিয়া করছে কোন সখীরে?'

'সখীর মাথায় মুতো হাসেম মিয়া। ওই সব কমলা সুন্দরীরা যাদু টোনা জানে। তা না হইলে কি আর গেরস্ত ঘরের পোলা গো মাথা ঘুরাইয়া দেয় এক নজরে? ওই সব সখী টখী সামনে আইতে দিবানা। কইবা, আমার পুতের পিছ না ছাড়লে হে গো তাঁবুতে আগুন লাগাইয়া দিমু নিজে গিয়া।'

যাত্রা পার্টির খেলা দেখেনি কখনো তাইজ্যা। নায়িকাদের রং চং মাখা মুখের রূপ বর্নণা শুনেছে গ্রামের ছোকরাদের মুখে। গলা নাকি মধুর মত মিষ্টি, গানের কোকিল পক্ষী একেক জন। উৎসাহ বোধ করে ফরিদপুর যেতে। মজু মামু না আসুক, যাত্রা তো দেখা যাবে ওর উসিলায়।

'আর যদি ফরিদপুর না পাস যাত্রা পার্টিটারে, মাদারীপুর যাবি তোরা। মাদারীপুর না থাকে তো কুষ্টিয়া যাবি। অপেরা পার্টিটা এক খান থন আরেক খানে ঘুইরা বেড়াইতে আছে।'

আরো খুশী হয় তাজু মিয়া। দেশ দেখা যাবে মজিদকে খুঁজতে গিয়ে।

মাথা নীচু করে কিন্তু হাত কচলাতে থাকে হাইশ্যা, 'সাইজ্যা নানীর শরীর খারাপ নানা। এখন তখন অবস্থা।'

ওর উৎসাহ দেখে মনে মনে হাসে তাইজ্যা। কারণটা বুঝতে পারে।

খেকিয়ে ওঠে মাতবর, 'নানীর শরীর খারাপ তো তোর কি? পোলা তো হইবো আমার বিবির। পেটে তোর বেদনা উঠছে নাকি?'

'না না সেই কথা না নানাজী। কবিরাজ ডাক্তার যদি ডাকতে হয়, রাইতে বেরাইতে যদি— আমি আর তাজু দুই জন চইলা গেলে—'

'থাম কমিনার বাচ্চা। পোলা বাইর করনের লাইগা ডাক্তার লাগবো

ক্যান ? তারা বিবি কি শহরের সাহেব সুবার মেম নাকি যে হের লাইগা ডাক্তার চাই, হাসপাতাল চাই। রুসা ছৈয়ালের মাইয়া, রাস্তা খান বারিষকালের গাংয়ের লাহান চওড়া। তরতরাইয়া নাইমা আইবো না পোলা ?'

অনেক ক্ষনের বিরতি শেষে তামাকে টান দেয় মাতবর, 'আর যদি টাইনা বাহির করতে হয়, তার লাইগা মইজ্যার মা আছে না ? দশ বারো-টা বিয়াইয়া তিনি তো এখন পাক্কা বিলাত ফেরত ধাত্রী। নিজেই নিজেরে টেরনিং দিয়া দিছে।'

তাইজ্যা আর হাইশ্যা চলে গেছে শহরে মজিদ মিয়ার সন্ধানে। মজিদ ফিরুক কি না ফিরুক, সেটার চেয়ে বড় কথা রূপসুন্দরী অপেরা পার্টির যাত্রা দেখতে পাবে দুজনে। মজুর নায়িকা বউয়ের সঙ্গে দেখা হবে, দু চারটা কথা হবে। উৎসাহে রোমাঞ্চিত হতে থাকে দু জন।

রোমাঞ্চিত হতে থাকে মাতবরও। বাড়িতে বয়স্ক বেটা ছেলে নেই বললেই চলে। সংকোচ বোধ করার কাঁটা সব সরিয়ে দিয়েছে পথ থেকে।

খাট পালং চৌকি দেরাজ নিয়ে নতুন তৈরী আটচালা ঘরটা সাজিয়ে তোলে। দরজায় পর্দা লাগায়, খিড়কিতে পর্দা লাগায়। বড় বিবির ঘর থেকে একটা বড় দেয়াল আয়না এনে কাঠের খুঁটির সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখে। সামনে গোল টুল।

এরি মধ্যে মাকড়সার ঝুলে ধরেছিলো ঘরটায়। টিকটিকির ডিম মাচানের ওপর এখানে সেখানে। সামনে দাঁড়িয়ে থেকে ঝেড়ে মুছে সব সাফ করায় মাতবর। কাজের বেটি ডেকে মেঝেতে কাদা গোবরের লেপ দেওয়ায়।

নতুন ঘর আরো নতুন হয়ে ওঠে।

পগারে বসে বেতফল চিবোতে চিবোতে বলে মরিয়ম, 'বড় মামু নাচনেওয়ালী মামী লইয়া আইবো। তাইজ্যা আর হাইশ্যা আনতে গেছে, কৈন্যা আনতে গেছে। নানা বড় বৌমার লাইগা ঘর সাজাইতে আছে। নিজে খাড়াইয়া থাইকা ফুলঘর সাজাইতে আছে।'

'তোমার মুণ্ডু। দেখবা নানায় আরেকটা বিয়া করবো। চাইর নম্বর নানীজান আনবো তোমার লাইগা। কইলাম দেইখো, দশ বছ মাইয়া—কচি মাইয়া যদি না আনছে, তয় গোবর খাই আমি। হে

দেইখাই বুঝছি, নানার খায়েশ নিভে নাই এখনো।' গুড়ো মরিচ জিভে তুলে দেয় আতরজান। মুখভর্তি ওরও কাঁচাপাকা বেতফল।

মেজো বিবি হাড়সর্বস্ব ফাতেমাকে সামনে পেয়ে হুকুম ঝাড়ে মাতবর, 'এখন থেইকা রসুই ঘরে যামুনা ভাত খাইতে। পোলাপানের চিল্লাচিল্লি, একটু চুপচাপ দুইটা লোকমাও গিলবার উপায় নাই। আমার খাওন আমার ঘরে দিবা।'

'কোন্ ঘরে ?'

'কোন্ ঘরে আবার ? নতুন আটচালা ঘরে। হেইটা সাজাইয়া ফিটফাট করছিনা নিজে খাইটা খুইটা ? আর—'একটু থামে মাতবর' 'আর আমার খাওন বাইড়া আনবো আত্তি। কাম নাই কাজ নাই, খালি খালি বইসা শুইয়া খাইয়া খাইয়া আমার গোলা শেষ করতে আছে। বিনা কামে ভাত কাপড় দিমু না কারো রে।'

সন্ধ্যার পরে পরে রাতের খাবার চায় গেদু মামুদ। মসজিদ থেকে মাগরেব নামাজ সেরে খড়মের শব্দ তুলতে তুলতে এসে ঘরে ঢোকে নতুন ঘরে।

'দে নাতিন, তোর সোন্দর হাতে ভাত বাইড়া দে।'

আতরজানের মুখের দিকে উৎসুক চোখে তাকায় মাতবর। ঘোমটার মত করে শাড়ি টেনে মুখ অর্ধেক ঢেকে রেখেছে ও। নীচের দিকে চেয়ে।

খাবারের ফাঁকে ফাঁকে গল্প করে মাতবর। এক সময় বলে, 'খাবি আমার লগে বইসা ? খা না দুই লোকমা।'

বলেই নিজ হাতে এক গ্রাস ভাত তুলে ধরে আত্তির মুখের সামনে।

'না আপনে খান। আমি পরে খামু হগলের লগে।'

'হগলের লগে খাবি ক্যান তুই ? আমার লগে খাবি। দুইজনে একলগে কথা কইয়া মজা কইরা খামু। নে খা দেখি মাছের মাথাটা।'

এবার একটা ভুনা কই মাছের মুড়ো বাড়িয়ে ধরে, 'খা নানার হাতে খা। আমি দেখি তোর খাওন।'

চোখে ঘোর বাড়ে মাতবরের। মনে মনে ভাবে, মইজ্যাটা বাজারের মেয়েলোকের পাল্লায় পড়ে ভালই করেছে। বাকী পোলাগুলোও আলাদা বাড়ি করে আলাদা সংসার পেতেছে। তাইজ্যা ও হাইশ্যা গেছে মাদারীপুর। আর দেরী চলেনা শুভ কাজে।

খাবার বাসন পেয়ালা তুলছে আর্তরজান ।

'জলদি জলদি খাইয়া আইবি আবার। মাথায় হাত বুলাইয়া ঘুম পাড়াইয়া দিবি নানাজানরে। তোর হাতের আঙ্গুলগুলা না—আঙ্গুল-গুলা—নারিকেল ফুলের মত চিকন চিকন।'

প্রশংসা শুনে মিটিমিটি হাসে আতরজান। দেখতে পায়না বুড়ো।

'আর কিমাম জর্দা দিয়া এক খিলি পান খাইয়া আইবি। তোর মুখে কিমামের ভাপে যা খুশবু না—'

'আপনে খাইবেন না ? নানীর মশলা দেওয়া মিঠা পান—'

'খামু। আতু জান, তুমি দিলে খামু। তোমার হাতে বিষও মিডা লাগে।'

কটাক্ষ করে তাকায় আতরজান, 'নানীরে পাঠাইয়া দিমু রূপার পানদান লইয়া।'

'নানী না। তুই আইবি। ক আইবি তো আমার ঘুম লাগাইতে ?' দ্বার্থবোধক মাথা নাড়ে আত্তি।

ছোট ছেলেমেয়েদের রাতের খাওয়া নিয়ে ব্যস্ত আতরজান। বাচ্চা কাচ্চাদের পরে নানীজানদের সামাল দেওয়া। তারপর অন্যান্য কামলা পুরুষদের জন্য কাচারি ঘরে ভাত পাঠানো। সবার শেষে কাজের মেয়েদের সঙ্গে পিড়ি টেনে বসে পিঠ টান টান করে।

খাওয়া সেরে পা টিপে টিপে পালাচ্ছিলো সেজো বিবির ঘরের দিকে। তারা বিবির টিনের কৌটা থেকে তুলে কালিজিরা চিবোতে বেশ লাগে খাওয়ার শেষে। তারা বিবি খায় সারা দিন। কালিজিরার রস খেলে নাকি বুকে দুধ বাড়ে, তাই।

হেসে টিপ্পনি কেটেছে তারা নানী কয়েক দিন, 'ওইলা আত্তি। তুই কাইল্যা জিরা খাস ক্যান ? শেষ কালে বিয়ান ছাড়াই বুকে দুধ নামবো। এমনিতেই তোর ওলান দুইটা ফাইটা যাইতে আছে, জিরা খাইয়া আর বড় করিসনা খবিসনী।'

'আতু। আতরজান।'

উঠোনে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে বুড়ো। ফিস ফিস করে ডাকে।

'পান আনছস নানার লাইগা।'

উপস্থিত বুদ্ধি আতরজানের, 'এই তো ভাত খাইয়া উঠলাম। নানা— যাইতে আছি আনতে।'

পানদানে করে পান নিয়ে নতুন ঘরে ঢোকে আত্তি। বিভিন্ন কৌটায় চুন, সুপারী, খয়ের, কিমাম, তানসেনগুলি—আরো কতো কি সব উপাদান।

'নেন। খান। আমি যাই তারা নানীর ঘরে।'

'তুই নিজ হাতে খিল্লি বানাইয়া দে।'

মসলা তুলে খিলি বানিয়ে বাড়িয়ে ধরে আতরজান।

'হইল না। মুখে তুইলা খাওয়াইয়া দিবি। তয় খামু।'

'না না। আপনে নিয়া খান।'

আরো কিছু বলবার আগেই খপ করে ওর হাতটা ধরে ফেলে মাতবর। পানের খিল্লি সমেত আঙ্গুল টেনে নেয় মুখে। দাঁত তো সব নেই। যে কয়টা রয়েছে সেগুলো দিয়ে কামড়ে দেয় আঙ্গুলের ডগা।

কঁকিয়ে ওঠে আতরজান, 'ছাড়েন নানা, ছাড়েন। কেউ দেইখা ফালাইলে—'

'কেডা দেইখা ফালাইবো? ফালাইলেই বা কি? আমার ঘরে আমার বাড়িতে আমি যা ইচ্ছা, তাই করুম।'

উঠে দুয়ারের দিকে পা বাড়ায় আতরজান। ভয় পেয়ে গেছে যেন বুড়োর ব্যবহার দেখে। হাতে ওর পানের পিকওয়ালা লালা বুড়োর মুখের।

'ওই যাইসনা সোনা। আমারে ঘুম লাগাইয়া দিয়া যা।'

কথার জবাব দেয়না আত্তি। নিঃশব্দে উঠোনে নেমে আসে। মনে মনে বলে, 'পলাইয়া যামু এখান তন। তাজু ভাই আইলেই নিরোদ্দেশ হইয়া যামু এই বাড়ি থেইকা।'

মেজোর ঘরে গিয়ে ফাতেমা বিবিকে পাঠিয়ে দেয় আতরজান, 'নানায় ডাকছে আপনেরে। মাইজ্যা নানী, পাংখা কইরা ঘুম লাগাইয়া দিতে কইছে।'

বহুদিন পর স্বামীর ঘরে ডাক পড়েছে। উৎসাহে পাণ্ডুর চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ফাতেমার। একটা তালের পাখা হাতে উঠোন পেরিয়ে নতুন ঘরে এগিয়ে যায় পা চালিয়ে।

হারিকেন বাতি কমিয়ে দিয়ে চালের দিকে মুখ করে শুয়ে আতরজানের অপেক্ষা করছিল মাতবর। খরগোসের মত কান খাড়া করে।

'কেডা?' উৎসাহে উঠে বসে মানুষের ছায়া দেখে।

'আমি। জয়নালের মা।'

'তুই? তুই কি চাস?' ঘেউ ঘেউ করে ওঠে গেদু মামুদ। ফাতেমা বিবির ছায়াও সহ্য হয় না যেন।

'আপনে নাকি ডাকছেন পাঙ্খা কইরা ঘুম লাগাইয়া দিতে।' মৃদু পায়ে এগিয়ে আসে ফাতেমা।

'তোমারে ডাকছি আমি? তোমারে? আমার পরানের বিবিজান গো।' মুখ খিচিয়ে ওঠে বুড়ো, 'যা ভাগ্। হাড় গিলা মড়াকাঠ কোন খানের। ভাগ ভাগ। আত্তিরে পাঠাইয়া দে। তামুক আনতে ক।'

রসুই ঘরের দাওয়ায় বসে বৈচা মাছ কুটছিলো আত্তি। এক ডুলো তাজা মাছ। মরেনি তখনো। গায়ে নতুন পানির পিছল বিলের মাছের।

পাশে এসে বসে মরিয়ম।

'কিলা আত্তি। বড় খুশী খুশী দেখি আইজকাল। জ্যৈষ্ঠ মাসের বৈচা মাছের মত তোর গতরও দেখি পিছলা হইয়া উঠছে।

'কই খুশী দেখলা? কি করলাম খুশীর?'

'দেখিনা মনে করছস? নানার লগে জব্বর পীরিত জমাইছস দেখি।'

'কই পীরিত জমাইলাম? তুমি কই দেখলা আমারে—'

আত্তির পিঠে ঠেলা দেয় মরিয়ম। খিলখিল করে হেসে ওঠে, 'বিবি আতরজান, গতরখান সামলাইয়া রাইখো। নানা আমাগো রসের নাগর। সতর ঢাইকা রাইখো সোনা।'

'যাহ্। কি সব খারাপ কথা কও মরিয়ম বু।'

'ঠিক কথাই কই আত্তি বেগম। মাতবরের গোষ্ঠীরে চেনোনা। মাইয়া মানষের নেশা হেগো রক্তে। যার উপর একবার দৃষ্টি গেছে, তারে ঘরে না আইনা ছাড়ন নাই। নানার দাদা বেঙ্গা মামুদ গাদা বন্দুক লইয়া পক্ষী শিকার করতে যাইতো জঙ্গলে। আর কি লইয়া ফিরতো জানো? যততো কালা কালা মাইয়া লোক। ধইরা বাইন্ধা

লইয়া আইতো। কোনটারে সাঙ্গা করতো, কোনটারে কয়দিন ফুর্তি-টুর্তি কইরা বিদায় দিতো।

কথা বলে না আতরজান। কৌতুহল নিয়ে শুনে যায়।

'নানার মায় আছিলো কেডা জানো? গুইসাপ মাইরা চামড়া ছিলাইতো এক বেডা। জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুইরা বেড়াইতো। হের কালা মাইয়ারে ধইরা আইনা নিকা করছিলো বেঙ্গা। হে আর আইজকার কথা? পুরান কালের কথা।'

নয়

পরের দিন দুপুর তক কোন মতে অপেক্ষা করে গেদু মাতবর। একবারও ওর সামনে আসেনা আত্তি। রান্নাঘর আর গচা ঘরের দিকে সরে সরে থাকে।

দুপুরের খাওয়া নিয়ে আসে মরিয়ম। চোখে ওর কৌতুকের নাচন, 'কি হইছে নানা? মুখখান অমন কালা কইরা বইসা আছেন ক্যান?'

মরিয়মের বিয়েটা ভেঙ্গে গেছে। সাইকেল আর নগদ টাকা দিতে রাজী হয়নি মাতবর।

বুড়োর পাতে গরম ভাত তুলে দেয়।

'মুখ কালা না কইরা হাসুম কেমনে ক? আমার সুখ আছে কোন? তিন তিনটা বিবি। একটার বাতের বিমারি, আরেকটার সুতিকা, আরেকটা আইজ বিয়ায় কি কাইল বিয়ায়।'

কথা শেষ করতে দেয় না মরিয়ম, 'তয় বুঝছি, নানাজানের খেদমত করে কেডা? আরেকটা নানী চাই। কি কন?'

'হ। কেমনে বুঝলি তুই?'

'বুঝলাম আপনের ভাবসাব দেইখা। একটা বুড়াথুড়া রাঁড়ি সাঙ্গা কইরা আনেন। কি কন?'

'তিনটা বুড়ি তো আছে ঘরে। তোমার আত্তিরে মানে আতরজানেরে কেমন মনে হয় নাতিন? কি কও?'

রঙ্গ করে মরিয়ম, হাসে খিলখিল করে, 'ওমা কন কি নানা। আত্তি তো আমার বয়সী। আপনের নাতনি পুতনির সমান।'

'কি হইলো তাতে? আমি কি আর বুড়া হইছি। এখনো হাঁইটা যাই বন্দরে। এখনো—'

এখনো আর কি পারে, সেটা মনে আসেনা মাতবরের।

'নাবালক মাইয়া নিকা করবেন নানা?'

'ধ্যেৎ নাবালক কেডা কইলো তোরে ? দেখস না কেমন ডেকি মুর-গির মত গোল গাল হইয়া উঠছে আত্তি। জোয়ান হইয়া গেছে কবে।'

লালমায় চোখদুটো চকচক করে ওঠে মাতবরের, আত্তির যৌবনের বর্ননা দিতে গিয়ে।

শান দেওয়া হাসি হাসে মরিয়ম, 'নানা, আতরজানের গতর দেইখা আপনের কলিজায় খায়েশ চাপছে গো! তয় মাইয়া রাজি হইবো তো ?'

'রাজি করা না সোনা। সোনা দিয়া মুইড়া দিমু আত্তিরে। হাত ভইরা চুড়ি দিমু, বালা দিমু, কানবালা দিমু, নাক ছাবি দিমু, বিছা দিমু, খাড়ু দিমু। দিয়া রাজরানী বানাইয়া দিমু।'

'অত কিছু দিলে নানাজী আমি মরিয়মই রাজি আপনারে সাঙ্গা করতে।' খিল খিল করে ওঠে মরিয়ম।

'তুই রাজি হইলে কেমনে হইবো ? শরিয়তে হারাম না নাতিনরে বিয়া করন।'

'হইলো। তয় আমার বিয়ায় কি দিবেন ?'

'তোর দুলারে একটা ঘোড়া কিনা দিমু। আগে আত্তিরে রাজি করা। তয় তোরেও দুই সের সোনার জেওর দিমু।'

'নানা। একটা সাইকেল আর দশ হাজার টেকার লাইগা নাতিনের বিয়াটা ভাইঙ্গা দিলেন। এখন—এখন কন্ দুই সের সোনা দিবেন আমারে। আপনে কিপটে বুড়া দুই ছটাক পিতলও দিবেন না জানি।আতরজান বিবির খুব পছন্দ আপনার চাড়াইল্যার দীঘিটারে। দীঘিটা হের নামে—'প্রসঙ্গ পালটায় মরিয়ম।

'চাড়াইল্যার দীঘি ? এইটা আর তেমন কি জিনিস ? পাইছি তো পানির দামে নায়েব তহশীলদাররে ফুসলাইয়া। কাইলই সদরে যাইয়া সাব কবলা কইরা দিমু। ঠিক কইছস তুই, আমার এন্তেকালের পর আওলাদ ফরজন্দ লইয়া খাড়াইতে হইবো তো ছোট বউয়ের। মইজ্যা হারামজাদা, জয়নাইল্যা কুত্তাটা হেরে জায়গা দিবো মাতবর বাড়িতে ? দিবো না।'

উৎসাহের চাপে খাওয়া বন্ধ রেখে বক্তৃতা ঝাড়তে থাকে মাতবর।

'বিয়ার পানি গতরে পড়তে না পড়তেই দেখি তোমার রূপ উথলাইয়া উঠছে ছোট নানী। সোনা অঙ্গখান রাংখা কদম ফুল।'

আতরবানুর গলা উদোম করে সোনার অলঙ্কারগুলো ফিরে ফিরে দেখে মরিয়ম। হাঁটু গেড়ে বসে আত্তি। পায়ে আলতার ছোপ লাগাচ্ছে আস্তে আস্তে।

'মসকরা কইরো না মরিয়ম বু।' আনত চোখে চেয়ে বলে, 'আমারে তুমি আত্তি বইলাই ডাকবা।'

'আত্তি ডাকুম? নাম ধইরা ডাকলে নানায় আমারে জবা কইরা ফালাইবো। আমাগো হগলরে ডাইকা কইছেনা বিহানে, তোমারে ছোট নানী কইয়া ডাকতে। তোমার বদনা আগাইয়া দিতে, ফুট ফরমাস খাটতে। তোমারে পালঙ থন নামতে মানা করছে না?'

'হাচা?'

'হ হাচা। ছোট নানী রাজরানী। যা সোন্দর হইয়া উঠছো না, রাইতে উঠানে নামলে আন্ধারও ফর্সা হইয়া যাইবো। গাল দুইখান তো সিন্দুরা আমের মত লাল টকটকা। টোকা দিলে ফাইটা রক্ত পড়বো।'

নতুন ঘরের দরজার সামনে বসে সুপোরি কোটে আতরজান। বিছানায় আতর ছড়িয়ে দিয়েছে মাতবর রাতে। মাথার ওপর লাল কাপড়ের ঝালর দেওয়া চাঁদোয়া। একটা বড়সড় খিলি মুখে পুরে দেয়। আরেকটা এগিয়ে দেয় মরিয়মের দিকে।

'মরিয়ম বু। তুমি আমারে নানীটানি কইবা না। আমার সরম লাগে।'

'সরম লাগে তো ঘোমটা দিয়া মশারীর তলে বইসা থাকো। নানার লগে উদাম হইয়া মহব্বত করবার সময় সরম লাগে নাই নানী? কও দেখি রাইত ভর কি কি করলা? কয়বার করলা?'

লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে আতরজান। গায়ে ওর দামী আতরের খুশবু। ম্লান হেসে বলে, 'আমারে জিগাও ক্যান? তোমার নানারে জিগাইলেই পারো।'

'নানাজানের মুখখান তো এতকাল পর খুব খুশী। রাইতভর তোমার মধু খাইয়া পেট ভরছে বুড়ার। এখন কাচারি ঘরে বইসা খোশ গল্প করতে আছে কামলাগো লগে।'

'কার লগে ? তাজু ভাইর লগে ? হেরা ফিরা আইছে ?'

'না হেরা ফিরে নাই। অন্য মুনিরা নানার লগে মসকরা করতে আছে তোমারে লইয়া। হেরা কয় নানারে দশ গেরাম ডাইকা জেয়াফত দিতে হইবো। দশ বিশটা গরু জবাই কইরা মস্ত খাওন। হেরা একটা কইরা গামছা বখশিশ চায় নানার কাছে।'

'দিছে ?'

'দিবো কইছে। নানা তোমারে পাইয়া খুশীতে দাতা হাতেমতাই হইয়া গেছে। গামছা ক্যান, চাইলে একটা কইরা লুঙ্গি দিয়া দিবো।'

সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় খাবার সেরে বিছানায় উঠে যায় গেদু মামুদ। শরীরটা বেশ চাঙ্গা বোধ করছে এ কয়দিনে। বুকের ভেতর হাঁপানির ঘড়ঘড়ানিও কমে গেছে। ঠিকই বলেছে কুদরত আলি হেকিম, 'মাতবর সাব, আমার কুদরতি হালুয়ার চাইতেও বেশী উপকারী কচি মাইয়ার লগে সহবত। সব টনিকের বড় টনিক বুড়া মানুষের লাইগা। দেখেন নাই—আগেকার জমানায় রাজা বাদশা, নবাব জমিদাররা বয়স বাড়লে খালি নাবালগ মাইয়া বিয়া করতো। কচিকচি বান্দী-দাসী রাখতো হেরেম ভর্তি কইরা। যোয়ান নারীর মুখের লালা সব চাইতে বড় সালসা মাতবর সাব। তার চাইতে বড় ওষুধ ইউনানী শাস্ত্রে নাই।'

এত শোনার পরেও বলেছিলো গেদু মামুদ, 'দাওয়াই কিছু দেন তবুও। মেশক আম্বরের গরম হালুয়া।'

মাতবরের কোলের কাছে পা তুলে বসে আতরজান। বাতি ইঁদুরের মত কুটকুট করে সুপোরির কুচি চিবোচ্ছে।

'শুইবি না ?'

ছোট বিবির পিঠের মেরুদণ্ড খোটে মাতবর নখ দিয়ে।

'জেওরগুলা খইলা ফালাই।'

'না। খুলবি ক্যান ? পইরা থাক। পরলে কি দারুন সোন্দর লাগে তোরে।'

'এত্তোগুলা জেওর। গায়ে বেড় বেড় লাগে। এখন খুলি, কাইল বিহানে উইঠা আবার পিন্দুম।'

'না। কাইল আমি মকামে গেলে খুলবি। আমার ফিরনের আগে আবার পিন্দা সাইজ্যা গুইজ্যা থাকবি। কাইল আরেকটা

সিলিকের লাল শাড়ি আনুম তোর লাইগা। আরেক জোড়া টেরিলিন আনুম বসাক গো দোকান থন।'

'তয় বাত্তি নিভাইয়া দেই।'

'না। আন্ধারে মুখ দেখা যায়? কথা কওন যায়?'

বল্লেই আতরজানের মুখখানা টেনে বুকে চেপে ধরে মাতবর। ওর হাড়ের নীচে ফুসফুসের মৃদু ঘড়ঘড়ানি শুনতে পায় আতরজান। চুপ করে থাকে শরীর ঢিলে দিয়ে।

এক সময় মাথাটা বুকের ওপর থেকে তুলে ধরে গেদু মামুদ, 'ঘুম লাগছে ছোটবউ?'

হাঁ না কিছু বলে না আতরজান। গলাটা শুকনো শুকনো মনে হয় ওর। নাক দিয়ে গরম শ্বাস পড়তে থাকে।

'আমার পা দুইটা টিপা দিবি? তুই দিলে আরামে ঘুম আইবো চোখে।'

উঠে মাতবরের পায়ের কাছে গিয়ে বসে আত্তি। আস্তে আস্তে পায়ের আঙ্গুল টানে, গোড়ার মটকা ফোটায়, টেপে খসখসে গোড়ালির চারপাশ। সারা শরীর পুড়তে থাকে ওর আগুনের ভাপে।

'কি কইরা আইলি তোরা? কি খবর নিয়া আইলি?

তাইজ্যা আর হাইশ্যাকে খুটিয়ে খুটিয়ে জেরা করে মাতবর।

'খবর ভালানা। মামুরে খুঁজতে খুঁজতে গিয়া পাইলাম ঈশ্বরদি। হে এখন যাত্রাপার্টিতে রাজপুত্রের দোস্ত। রোজ রাইতে প্যাণ্ডেলের তলায় এক্টো করে মজু মামু।'

'তারপর? বিয়া শাদী?'

'হ বিয়া করছে। যাত্রার কমলাসুন্দরীরে। একদম সুন্দর না নানা। বুড়া বুড়া চেহারা। মাথায় নকল চুল। মুখে শাদা রং মাইখা হেও এক্টো করে।'

'খবর ঠিক তা হইলে? আমার মুখে, আমার বংশের মুখে চুনকালি মাইখা ছাড়ছে হারামজাদা? খানকী বিয়া করছে শুয়োরের বাচ্চা?' গর্জাতে থাকে মাতবর, 'আসুক একবার বাড়ি। বেতাইয়া হোগার ছাল তুইলা ছাড়ম।'

'আইবোনা আর। হেরা ঈশ্বরদী থন নওগাঁ যাইবো। নওগাঁ থন বগুড়া। অনেক বায়না পাইছে অধিকারী।'

'আইবো না ?' হঠাৎ কি যেন ভাবে মাতবর। মুখখানা স্বাভাবিক হয়ে আসে। আইলে বাড়িতে ঢুকতে দিমু ? ত্যাজ্য পুত্র করুম কুত্তাটারে। পুব মাঠের জমিনগুলাও সব লেইখা দিমু ছোটবউরে। একটা কানাকড়িও দিমুনা মইজ্যারে। হারামী সখের যাত্রা করে, মান ইজ্জত সব ডুবাইছে আমার। হেই হালা আমার পোলা না। আমার বীর্যে— '

একটু নরম হওয়া মেজাজ আবার চড়ে যায় মাতবরের। চিৎকার করে বলে, 'তামুক আন হাইশ্যা। দেখতে আছস কি শালা খাড়াইয়া খাড়াইয়া ?'

পনেরো দিন ধরে একটানা নানা জায়গায় ঘুরে মাত্র বাড়ী এসে উঠেছে। আসতে না আসতেই মাতবরের মেজাজ দেখে ভড়কে যায় দু'জন। হুঁকো আনতে সরে যায় হাশেম। তাজু মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ।

'তোর পোটলায় কিরে তাইজ্যা ?' স্বর কিছুটা নরম হয়ে ওঠে মাতবরের, 'কি আনছস বিদেশ থন ?'

থলের মুখ মেলে ধরে তাইজ্যা। ভেতরে ওর জামা কাপড়। আর একটা নতুন তাঁতের শাড়ী।

'শাড়ী পাইলি কই ? শাড়ী দিয়া কি করবি তুই ? কি ? বিয়া শাদীর মতলব আছে নাকি নাবালক পোলার ? লুঙ্গির তলা চুলকাইতে আছে মোচ দাড়ি ভালা কইরা না গজাইতেই ?'

অশ্লীল মন্তব্য মাতবরের।

'না না নানাজী।' আমতা আমতা করে তাইজ্যা, 'আত্তির লাইগা— এই মানে আতরজানের লাইগা শাড়ীখান আনছি মাদারীপুর থন কিনা ?'

'আরে জানোয়ারের বাচ্চা, আত্তি কি, আত্তি কি রে ? নানীজান ডাকবি, এখন থন ছোটনানী ডাকবি আতরজান বিবিরে। বড় নানী, মাইজ্যা নানী, সাইজ্যা নানী, ছোট নানী—চাইর নানী তোর।'

কি বলে মাতবর ? বিস্ময়ে হতভম্ভ হয়ে যায় তাইজ্যা। তাহলে এ কয়দিনের ব্যবধানে—

'কি পচা শাড়ী আনছস বেকুব। তোর নানী বুঝি টানা জালের

লাহান পাতলা পচা শাড়ী পিনবো। পঞ্চাশ টাকা দামের শাড়ীতো ছোট বউয়ের বান্দিদাসীও হাতে লইবো না।'

হা করে চেয়ে থাকে তাইজ্যা। ছোট বেলায় মৌলভীর ওয়াজ শুনেছে, কঠিন বিপদের সময় 'ইন্না লিল্লাহ' পড়তে হয় এগারো বার। সেটাও পড়তে ভুলে যায়। একি হলো? এ কি করলো মাতবর?

নতুন কোর্তা গায়ে গেদু মামুদের। পরনে নতুন সিল্কের চেক চেক লুঙ্গি। মাথায় গোল কল্লিদার টুপি।

ভুর ভুর করে দামী আতরের গন্ধ ছড়াচ্ছে মাতবর বাতাসে। দু'সপ্তাহের ব্যবধানে অর্ধেক চুল ওর কালো হয়ে গেছে। চেহারা বেশ তেলতেলে।

নিঃশব্দে বাড়ির ভেতরের দিকে এগোয় তাইজ্যা।

'ওই বেকুব। এখন থেইকা তুই আর হাইশ্যা আন্দর বাড়ি যাইবিনা। পর্দাপুশিদা মাইনা চলবি। ভেতর বাড়ির কামকাজ মাইয়াছেইলারা করবো। তোরা গরু ছাগল দেখবি, ঘাস কাটবি, মাছ ধরবি, হাট বাজার করবি। বুঝলি?'

মাতবরের মুখের দিকে ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে তাইজ্যা। স্বগতোক্তির মত করে বলে, 'হ।'

নতুন আকাশী রং শাড়ীখানা তখনো ধরা ওর হাতে। কি করবে ওটা, বুঝে পায় না।

'উঠাইয়া রাখ গামছার লাহান শাড়িখান তোর। বিয়া শাদী যদি করাই তোঁরে কোনদিন, কামে লাগবো তখন।' খড়মের শব্দ তুলে অন্দর বাড়িতে এগিয়ে যায় গেদু।

দশ

দু'দিন ধরে একটানা বেদনায় ছটফট করতে করতে শেষটায় মাঝ-রাতে একটা মরা ছেলে প্রসব করলো তারা বানু। বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি। বৃষ্টির কান্না না তারা বানু কান্না ঠিক বুঝতে পারছিলো না আতরজান। তবুও কেমন যেন ঘুম আসছিলোনা, মনে হচ্ছিলো কারা যেন জোরে জোরে কাঁদছে মেজো সতীনের ঘরে।

দরজায় আঘাত পড়লো একটু পরে, 'ছোট নানী, ছোট নানী, ওঠো। সাইজ্যা নানীর যায় যায় অবস্থা। মরা ছেইলা বিয়াইয়া নানীর ফিট লাগছে।'

'কে? মরিয়ম?' ধড়ফড় করে উঠে বসে আতরজান, 'কি হইছে? মরা ছেলে? ফিট লাগছে?'

'হ। দাঁতে দাঁত লাইগা গেছে নানীর।'

মাতবরের গায়ে ধাক্কা মারে আতরজান, 'কই ওঠেন। সাইজ্যা বু'র অবস্থা খারাপ।'

জেগে ছিলো বোধ হয় মাতবর। অক্টোপাসের মত বেষ্টন করে ধরে আতরজানের শরীর, শুইয়া থাক্। বৃষ্টির মধ্যে উঠানে নামবি নাকি? ভিজা চুবচুবা হইয়া যাবিনা?'

'না না। মরা পুত—ওই যে বিলাপ করতে আছে রহিমা আর যোবেদারা। মরিয়ম খাড়াও তুমি—'

জোর করে উঠে যায় আতরজান।

'কই যাস্ মিছা মিছা? জানতাম আমি আগেই, মরা বাচ্চা বিয়াইবো তারা বিবি।'

'আপনে যাইবেন না দেখতে? আহা রে। নিজের ফরজন্দ।'

'না। আমি যামু ক্যান? কেটা কইলো আমার ফরজন্দ?' আলস্যভরে পাশ ফিরে শোয় মাতবর, 'জ্বীনের বাচ্চা। জ্বীনের ভর না তারার উপর? জ্বীনে পেট লাগাইছে, ঠিক সময়মত গলা টিপা শেষ

কইরা দিছে পোলার। ঘুমা ঘুমা, তুই গিয়া সামনে খাড়াইবি তো তোর উপর ভরট হইবো গোঙ্গা ভুত। আমার বাচ্চা কেমনে কস? পয়দা করার শক্তি আছে আর আমার? দেখস্ না তোর বদনখান হাতাইয়াই খতম।'

ভুতের ভীষণ ভয় আতরজানের। বাইরে যমঅন্ধকার। শোঁ শোঁ করছে বাতাসের ঝাপটা।

খাটের ওপর উঠে দাঁড়ায়। মৃদু স্বরে বলে, 'মরিয়ম, তুমি যাও। আমি বিহানে আসুম। মাতবর সাবে ভয় পায় একলা ঘরে।'

বলে আবার মোটা কাঁথার ভেতর ঢুকে পড়ে আতরজান। ওকে বুকে টেনে নেয় গেদু। ব্লাউজের বোতাম খুলেছিলো সাঁঝ রাতে, সেখানে হাত ঢুকিয়ে ওর স্তনের বোঁটা খুটতে খুটতে ঘুমিয়ে পড়ে। ভীষণ মন খারাপ করে অন্ধকারে জেগে থাকে আত্তি ওপরের দিকে চেয়ে। একটুক্ষনের মধ্যে আবার বুকের ভেতরের ঘড়ঘড়ানি শুরু হয় মাতবরের।

ভোরের বেলা বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে পুকুর পাড়ে গর্ত খোড়ে তাইজ্যা আর হাইশ্যা। তারাবানুর ছেলেটাকে সাদা কাপড় পেচিয়ে পুতে দেয় কবরে।

একটানা বল্লমের ঘা খাওয়া হরিণীর মত কাঁদতে থাকে তারা। করুণ কান্নার সুর ঝড়ো বাতাসেও শুনতে পায় কামলা মুনিরা কাচারি ঘরে বসে।

একটা বিড়ি ধরিয়ে গম্ভীর মুখে বলে হাসেম, দেখলি তাইজ্যা. বেরহম বেদিক মাতবরের কারবার। বাচ্চাটারে একটাবার দেখলোনা পর্যন্ত। তারা নানীটা বুক ফাটাইয়া কাঁদতে আছে। একবার হের ঘরেও গেলো না। দুইটা ভালা কথাও কইল না।'

'তুই হেইটাই দোষ দেখলি কেবল? হারামীর পুত যে কচি মাইয়া আত্তিরে ফুসলাইয়া সাঙ্গা করলো, হেইটা তোর খারাপ মনে হইলো না? বেডা হায়ওয়ান জানোয়ার কাঁহাকার।'

বাড়ীর পোষা কবুতরের বাচ্চা সব খেয়ে শেষ করেছে গেদু মামুদ। কবিরাজ বলেছে, বাচ্চা পাখীর শুরুয়া খেলে নাকি শক্তি বাড়ে। হারানো তাকত ফিরে আসে।

রোজ ছটকি পেতে ডাহুক ধরে হাইশ্যা। ডাহুকের ঝোল নাকি খুব উপকারী পড়ন্ত শরীরে। গরম শুরুয়া খায় মাতবর বাটি ভরে ভরে।

দুপুরে হাটে গেছে মাতবর। নিজে দেখে দেখে বাচ্চা মোরগ কিনে আনবে। বাড়ীরগুলো সব বুড়া বুড়া। খাঁচা মাথায় সঙ্গে গেছে হাইশ্যা। এক খাঁচা বাচ্চা চাই, দুবেলা দুটো করে খাবে মাতবর।

উঠোনের মাথায় তরজার বেড়া। বেড়ার ওপাশে দাঁড়িয়ে আতরজান, এপাশে তাইজ্যা।

একটা ছোট ছেলেকে বাহির বাড়ী পাঠিয়ে তাইজ্যাকে ডেকে এনেছে। গায়ে ওর কড়া আতরের সুগন্ধ। বেড়ার ফাঁক দিয়ে আবছা দেখা যাচ্ছিলো, পরনে চওড়া লালপাড় শাড়ী। আরো যেন লম্বা হয়েছে এ কয় দিনে। আরো যেন স্বাস্থ্যবতী।

বেড়ার আড়াল ভেঙে সামনে যেতে সাহস পায় না তাইজ্যা।

'তাজু ভাই।'

'কি ?' কেঁপে ওঠে তাইজ্যার কণ্ঠস্বর।

'ভালা আছো তুমি ?'

'আছি। তুই ? তুমি ?'

'আমার আর ভালা কিসের ?' একটা দীর্ঘশ্বাস যেন টুকরো টুকরো হয়ে বেরিয়ে আসে আতরজানের বুক থেকে। তাইজ্যার তাই মনে হয়।

দু'জন নীরব কতক্ষণ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেড়ার পাটশলা ভাঙে তাইজ্যা। অবশেষে ধীর কণ্ঠে বলে, 'এ কেমনে হইলো ? এ কেমনে করলি তুই ?

' আমি করলাম কই ? আমি তো কিছু করি নাই।'

'তুই রাজী না হইলে—'

'মাতবরের ফেন-পানি খাইয়া বড় হইছি। হের বাড়ীর বান্দিদাসী, আমার আবার রাজী অরাজী কি ?'

'তুই কবুল না কইলে কি আর হে কবুল করতে পারে ?'

'আমি তো কবুল কই নাই।' টেনে টেনে নীচুস্বরে বলে আতরজান।

'তয় ? তা হইলে ?'

'আমি তো মুখ বন্ধ কইরা চুপচাপ আছিলাম। আমারে বিলকিসের বাপে কইলো, 'কও তো সোনা তুমি রাজী, হগলরে শুনাইয়া কও।'

'তারপর ?'

'আমি কিছু কই নাই। হেরা তিন চাইর বার জিগাইছে। মুখ খুলি নাই।'

'তা হইলে ?'

'তখন বিলকিসের বাপে কয়, মাইয়া ছেলার শব্দ কইরা এজেন দেওনের দরকার লাগেনা। শরমে মুখ খুলতে আছে না মাইয়া। এট্টুন পোলাপান, বালেগ হইছে কি না হইছে। হের চুপ থাকন মানেই হইলো এজেন দেওন। হগলে আলহামদুলিল্লা কন, মাইয়া রাজী আছে।'

'তারপর ?'

'তারপর আর কি ? মোল্লা সাবে বিয়া পড়াইয়া দিলো। বাতাসা খাইলো হগলে। জেয়াফত দিলো মাতবর সাব। বাস। সব শেষ হইয়া গেলো।'

যত দিন যায়, আতরজানের যত্ন আত্তি বাড়তে থাকে তত। একটা কাজের বেটি আলাদা ভাবে নিযুক্ত করেছে গেদু মাতবর। মরনির মা। দিনভর দুয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে, কখন কি দরকার হয় ছোট বিবির। এতদিন মরনির মার সঙ্গে খেটেছে আতরজান। এখন বেটি ওর হুকুমের অপেক্ষা করে।

'ছোট বিবি, মাথায় তেল দিবেন ? খোশবাসী তেল দিয়া দেই মাতবর সাব আসনের আগে ? চুল বাইন্ধা দেই উঁচা খোঁপা কইরা ?'

'দেও নানী।'

মরনির মা'কে আগের মত নানী ডাকে আত্তি। পাশে পিঁড়িতে বসিয়ে গল্প করে মাতবর মাঠে গেলে।

'উকুন আছে নানী ? দেখোতো ভালা কইরা। মাথার তালুতে খালি খাউজায়।'

আজানু লম্বা চুলে বিলি করে বুড়ি। উকুন মারে দু'হাতের নখের নীচে পিষে। মহিষের সিং দিয়ে তৈরী কাঁকই এনে দিয়েছে মাতবর। কাঁকইয়ের টানে দু'একটা বেরিয়ে আসে ঘন চুলের জঙ্গল থেকে।

কখনো পদ্ম খোঁপা বেঁধে দেয় মরনির মা, কখনো লম্বা সাপ বেনী। ঘাড়ে গলায় বগলের নীচে পাউডার ছড়ায়। সাজিয়ে দিয়ে বলে, 'একদম রাজরানী তুই আতু। মাতবরের সাত জনমের ভাগ্য, তোর লাহান

সোন্দর বিবি পাইছে। ঠোঁট দুইখান কি, এক জোড়া পুঁটি সাঁপলা, রসে টুবটুব করতে আছে।'

ঘাড় বাঁকিয়ে হাসে আতরজান, 'নানী, আমার খালি ডর ডর করে।'

'ক্যান ?'

'বুড়া যদি মইরা যায় ? আমি কই যামু হের কিছু একটা হইয়া গেলে ?'

'দূর পাগলী। মরবো ক্যান মাতবর। এখনো বহুত শক্ত বুড়া। আরো দুই চাইর খান সাঙ্গা করনের তাকত হের শরীলে।'

মাঠের কি চরের জমিজমা দেখে, বাথানে গরু মহিষ মুনিকামলার তদারকি করে যখন বাড়ী ফেরে মাতবর, হাতে ওর এক হাঁড়ি রসগোল্লা, কি জিলিপি। ময়রা বাড়ী থেকে নিয়ে এসেছে ফেরবার পথে। আতরজানের মিষ্টি খুব পছন্দ, তাই।

'কই ? ছোট বউ কই ?'

হাঁড়ি হাতে হাঁক ছাড়ে। ছোট বিবি বের হবার আগেই বেরিয়ে আসে মরিয়ম, 'কি নানা। কি আনছেন আমার লাইগা।'

হাসে মাতবর, 'তোর ছোট নানীর লাইগা মিডাই আর তোর লাইগা মিডাইর খালি হাঁড়ি।'

হাঁড়িটা কেড়ে নেয় মরিয়ম, 'কই ছোট নানী কই, নানার পরাণের পরাণ জানের জান, ছোট বেগম কই ? দেখো দেখো, নানায় তোমার লাইগা জিলিপি আনছে। তুমি সবটা একলা খাইও না, পেট ছুটবো এক হাঁড়ি খাইলে। দুই চাইরখান আমাগোরেও দিও।'

দুয়ারে এসে দাঁড়ায় আত্তি। পরণে পাটভাঙা শাড়ী। মাথায় আধো ঘোমটা টানা। পরিপাটি সিঁথির দু'পাশে দু'টো দীর্ঘ বেনী।

বর্ষা আসে ঝমঝমিয়ে। পাছে পা পিছলে পড়ে যায় ঘাটে, সে ভয়ে মাতবর ওকে পুকুরে যেতে দেয় না গোসল করতে। মরনির মা কলসী ভরে পানি তুলে দেয়। ঘরের পেছনে তরজার বেড়া দিয়ে গোসলখানা বানিয়ে দিয়েছে হাইশ্যা মাতবরের হুকুম মত। সেখানে উঁচু জলচৌকিতে বসে গোসল করে। সুগন্ধি সাবান মেখে পিঠ ঘসে দেয় মরনির মা, বদনা ভরে পানি ঢালে শরীরে।

মাঝে মাঝে মরনির মাকে সরিয়ে দিয়ে মাতবর নিজেই এগিয়ে আসে গোসলখানায়। বদনাভর্তি পানি নিয়ে বলে, 'দে আইজ আমি

তোরে ঘইসা মাইজা ধোয়াইয়া দেই।'

'না না আপনে যান। আমি নিজেই পারুম।'

কথা শোনে না মাতবর, 'যামু না। আমি তোমার ভিজা গতর দেখুম ছোট বউ। তোমার সতর দেখুম জান ভইরা।'

মৃদুস্বরে বলে আতরজান, 'আমার সরম করে। মরিয়মরা কেউ দেইখা ফেলবো—রাইতে দেইখেন।'

'না কেউ দেখবো না। কেউ আইবো না এই দিকে। রাইতে দেখনের এক মজা, দিনে ভিজা বদনে আরেক মজা।'

বলেই শরীরের উর্ধাংশ থেকে ভেজা শাড়ী সরিয়ে নেয় মাতবর। একটা সুগন্ধি সাবান নিয়ে বুক পিঠ কোমর সব ঘসতে থাকে আতরীর।

মাঝে মাঝে আদর করে আতরজানকে আতরী ডাকে। কখনো আতুজান, কখনো আতরী, আবার কখনো আতর।

'আতরের খুশবু তোমার গতরে। হের লাইগা তোমারে ডাকি আতরী, আমার আতরী সোনা।'

বলেই বিবির ভেজা ঠোঁট উঁচিয়ে ধরে চুমু খায় মাতবর।

ওকে ঠেলে সরিয়ে দেয় নগ্নপ্রায় আতরজান, 'সরেন সরেন। মরমির মা আইয়া পড়বো। বেড়ার ফাঁক দিয়া যদি কেউ উঁকি দেয়?'

'তরজার ফাঁকে মানষে দেইখা ফেলবো, তোমার যদি সেই ভয় থাকে সোনা, আমি তয় রাজমিস্ত্রী ডাইকা ইট আনাইয়া পাক্কা গোসলখানা পাক্কা পায়খানা সব বানাইয়া দিমু। তোমারে পুকুরে নামতে দিমু না, জঙ্গলে টাট্টি করতে যাইতে দিমু না।'

মাতবরের কথা মত বড় বিবির ঘর থেকে দাদার কালের বিরাট সাইজের চিলুমচিটা আতরীর ঘরে নিয়ে এসেছে মরনির মা। রাতে উঠোনে নামতে দেয় না মাতবর। মেঝেতে চিলুমচি পেতে ওতে ছোট প্রয়োজন সারে আতরজান। ভোরে পিতলের চিলুমচি সাফ করে মেজে ঘসে নিয়ে আসে বুড়ি।

প্রথম প্রথম চিলুমচি ব্যবহার করতে আপত্তি করতো আতরী।

'কিচ্ছু হইবো না। আমি ছাত্তি মাথায় দিয়া উঠানে গিয়া বসি।'

'না গো সোনা। আন্ধারে তুমি উঠানে যাইওনা। তারার লগে ভুত পেত্নী আইছে এই বাড়ীতে। বেমওকায় পাইলে তোমার উপর আসর

পড়বো। খুবসুরত আওরতের উপর নজর বেশী দেওদানবের। কাঁচা শরীলের উপর খুব লোভ। হাঙ্গের বাদে তুমি উঠানে নামতে পারবা না কইলাম।'

ম্লান হাসে আতরজান। অত সুখ দেখে ছোটবেলার কথা মনে পড়ে যায়। বিনা পথ্যে বিনা চিকিৎসায় মরে যাওয়া কানা নানীর চুপসানো মুখখানা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। পরলোকগত বাপ মার ঝাপসা স্মৃতি রোমন্থন করে মনে মনে।

এগারো

সন্ধ্যার পর থেকে জোর বাতাস উঠেছে। বাইরের অন্ধকারে নারকেল সুপারি গাছের ডগাগুলো শর শর শব্দ করছে। নদীর দিক থেকে তুফানের তোড়, রাতে হয়ত ঠাটা সহ বৃষ্টিপাত শুরু হবে।

গেদু মামুদ সদরে গেছে সেই ভোরে। দুদিন পর ফিরবে। ছয় মাসে এই প্রথম বাইরে রাত কাটাচ্ছে আতরজানকে ছেড়ে। কাজে কর্মে কোথাও গেলেও মাঝ রাতের আগে ফিরে এসেছে, বুকে জড়িয়ে ধরে গালে নাক ঘসে আদর করেছে। বলেছে, 'ইস কতো রাইত হইয়া গেলো ছোট বউ, তুই বুঝি না খাইয়া না শুইয়া বইসা রইছস? ইস্‌রে, এত্তো আদর বুড়ার লাইগা। জোয়ান বয়সে যদি বুকে পাইতাম তোরে, এক পলকও বোধ করি চক্ষের আড়াল হইতে দিতি না।'

সদরে দেওয়ানী মামলা ঠুকেছে মাতবর নদীর মাঝ সীমানায় নতুন জেগে ওঠা চর নিয়ে। ওপারের গ্রামের জমির সিকদার দাবী করেছে নতুন চর। দাবী করেছে গেদু মাতবরও। বাথানের এক পাল মহিষ ছেড়ে দিয়েছে দখলের প্রমাণ স্বরূপ। মুনি কামলা রাখালরা লাঠি সড়কি হাতে পাহারা দিচ্ছে চরের এমাথা ওমাথা।

শক্ত যুক্তি মাতবরের। ওর পরদাদা কুরকুরু মামুদের দুই শ' কানি জমি ছিলো নদীর এপারে। দলিল পত্র এখনো মওজুদ আছে লোহার সিন্দুকে, নকল রয়েছে তহশীলদারের কাচারিতে। সে জমি ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে বেঙ্গা মামুদের জমানায় নদীতে বিলীন হয়ে গেছে। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে দো ফসল তিন ফসলের উর্বর ক্ষেতগুলো।

তারপর আজ এতো বছর পর নদী সরে গেছে দক্ষিণে। নতুন চর জেগে উঠেছে মাঝখানটায়। নারীর তলপেটের মত ঠাণ্ডা মসৃন চর। কচি কচি ঘাস বালু ফুঁড়ে ভেসে উঠেছে। গেদু মামুদের মনে হয়, সবুজ ঘাসগুলো আতরজানের নরোম উরুতের কোমল ঘাস যেন।

মাঝ নদীতে চর। স্রোত ভাগ হয়ে গেছে চরের দুপাশে। মাটির

নীচে সোনার খনি পলিপড়া চরের। ধান, মিষ্টি আলু, কলাই, সরিষা যাই লাগাও না কেন, ফলবে খাঁটি সোনার মত। এ চরের দাবী কেমন করে ছেড়ে দেবে মাতবর?

জমির সিকদারই বা কেন বসে থাকবে? ওরও দাদার জমানায় ওপাড় ভেঙ্গে গেছে নদীর। ওরও তো পূর্ব পুরুষের ক্ষেত সব তলিয়ে গেছে স্রোতের টানে।

মাথা ফাটাফাটিতে যায়নি জমির সিকদার। আদালতে গেছে পুরনো কাগজপত্র নিয়ে। সমান দাবী নিয়ে ছুটেছে গেদু মামুদও। নরেন্দ্র উকিল শহরের সেরা এডভোকেট, দেওয়ানী আদালতের মারপ্যাচ সব ওর নখাগ্রে। নরেন চক্রবর্তীকে সিকদারের আগে গিয়ে ধরেছে মাতবর। সিকদারের উকিলের আগে মামলা ফাইল করেছে নরেন বাবু। ব্রিফ খাড়া করেছে দলিল-পত্র ঘেঁটে।

'ছোট বউ। দুই তিন দিন থাকুম সদরে। মামলা জিতুম ঠিক ঠিক। পয়সা কিছু খসবো, এই আর কি। ডরাইবা রাইতে একলা ঘরে?'

'না ডরামু ক্যান? মরনির মা থাকবো না কাছে।'

'হ। বুড়িরে মাটিতে শোয়াইয়া রাইখো চাটাই বিছাইয়া। চরটা তোমারে লেইখা দিমু মামলা জিতলে। তোমারে বিয়া করছি, নদীতে চর জাগছে। তোমার ভাগ্যে এততো বড় চর উঠছে। আগে এন্তোকাল তো উঠে নাই। কি কও, চরটা তোমার পাওনা না? দেনমোহর হিসাবে এইটা দিমু আমার আতরসোনারে।'

বলেই দু'হাতে পাঁজাকোলা করে শূন্যে তুলে নেয় আত্তিকে। বুকের সঙ্গে চেপে ধরে। মুখের কাছে মুখ নিয়ে ভেজা ঠোঁটে চুমু খায়।

'দুই দিন কি তিন দিন থাকুম সদরে। আসনের কালে তোমার লাইগা কি কি আনুম কও তো ছোট বউ?'

'কি আনবেন? কিচ্ছু আনবেনা। সবই তো আছে।'

'থাকলেই বা কি। এক জোড়া পাতলা মসলিনের শাড়ি আনুম। গা দেখা যাওয়া শাড়ি! তোমার শরীলটা যা সোন্দর লাগবো না হালকা জামরং কি কচ্যা রং শাড়ির নীচে।

মৃদু হাসে আতরজান মাতবরের কথা শুনে। কিছু বলেনা।

'আরো অনেক জিনিস আনুম। বেলাউজ, শায়া, সেমিজ, স্যাণ্ডেল,

জুতা—কও কি কি লাগবো আর ?

বেরোবার মুখে আবার আদর করে গাল টেনে দেয় মাতবর।

মাঝ রাতে বাতাসের দাপাদাপি কমে আসে। বাইরে তখনো গাঢ় অন্ধকার। খাটের নীচে মেঝেতে শুয়ে মরনির না। মৃদু নাক ডাকাচ্ছে বুড়ি।

ঘুম আসেনা আতরজানের। হাত পা জ্বালা করছে সেই ভোরে গেদু মাতবরের যাওয়ার সময় থেকে। দুপুরে পুকুরে নেমে ডুবিয়েছে অনেকক্ষণ। বেশ কয়েকমাস পর এই প্রথম। এতকাল মাতবর দেয়নি ঘাটে নামতে। মাথায় ঠাণ্ডা পানির ঝাপটা দিয়েছে গলা পানিতে দাঁড়িয়ে। তবুও কেমন যেন অস্বস্তি, শরীরের ভেতর জ্বলছে যেন এক-টানা।

বাহির বাড়ির কাচারিঘরে চাটাই পেতে শুয়ে তাইজ্যা। চোখ মেলে চেয়ে রয়েছে খিড়কি গলিয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে। কয়েকটা হাতেপাকানো বিড়ি টেনে শেষ করেছে।

চোখ একটু লেগে এসেছিলো বুঝি। পগার পাড়ে শেয়ালের ডাকে তন্দ্রাটা ভেঙ্গে গেলো। উঠে বসে পা মেলে।

পাশের চাটাইয়ে শুয়েছিল হাসেম। নেই তো? কোথায় গেলো এত রাতে? চুপচাপ বসে থাকে। কই ফিরছেনা তো হাইশ্যা। তবে তবে কি মাতবরের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে অন্দর বাড়ি গেছে চুপি চুপি? তারা বানুকে কি আবার গর্ভবতী করতে ওর ঘরে ঢুকেছে মাঝরাতের অন্ধকারে? মাতবর বাড়ি টিকে থাকার একটা অব-লম্বন দিয়ে ছাড়বে ও সাইজ্যা বিবিকে?

নিঃশব্দে বেরিয়ে আসে তাইজ্যা। কাচারির উঠোনে এসে দাঁড়িয়ে থাকে অনেক্ষণ। তারপর পায় পায় এগোয় অন্দর বাড়ির দিকে।

টিনের বেড়ায় মৃদু টোকা শুনতে পায় আতরজান। হরিণের মত চমকে ওঠে। কান খাড়া করে শোনে।

আবার মৃদু টোকা। গুনে গুনে তিনবার।

এ সংকেত চেনা আতরীর। ঢেঁকি ঘরে যখন মাদুর পেতে শুতো ছোট বউ হওয়ার আগে, মাঝ রাতে এমনি ভাবে তরজার বেড়ায় টোকা দিতো এসে তাজু ভাই। শুকনো পাটখাড়ি ভাঙতো ভিটির পাশে দাঁড়িয়ে।

পা টিপে টিপে নিরবে ঘরের পেছনে নেমে আসে আত্তি। মরনির মা পাশ ফিরে শুয়ে মৃদু গোঙাচ্ছে ঘুমের ঘোরে। নিবু নিবু করে রাখা হারিকেন বাতিটা নিভিয়ে ঘর সম্পূর্ন অন্ধকার করে দিয়েছে বেরোবার মুখে।

'তাজু ভাই।' ধপধপ শব্দ হচ্ছে বকের ভেতর।

'আত্তি! আতু।' কম্পিত হাতে আতরজানের হাত স্পর্শ করে তাইজ্যা। ফিসফিস করে বলে, 'ঘুমাস নাই? জাইগা আছস?'

'হুঁ। তুমি ঘুমাও নাই? কখন আইছো এইখানে?'

'এই তো এখন!' ঘনিষ্ঠ হয়ে আসে তাজু, 'মরনির মা কই?'

'ঘরে। ঘুমাইতে আছে।'

আলগোছে আতরজানের পিঠে হাত বোলাতে থাকে তাইজ্যা। পিঠের ওপর এলিয়ে দেওয়া চুলের রাশ সরিয়ে দিয়ে ওর ঘাড়ের ত্বক স্পর্শ করে।

'আত্তি। আমার আতু। আমার আতু সোনা।' মৃদু কণ্ঠে বলতে থাকে কানের কাছে মুখ নিয়ে। মিষ্টি সুগন্ধ ওর চুলে, কানের লতিতে।

নিজেকে ধরে রাখতে পারেনা আত্তি। ঝাড়া বাতাসের আঘাত খাওয়া পাখির মত ঝরে পড়ে তাইজ্যার প্রশস্ত বুকে।

'তাজু ভাই। তাজু ভাই। কই তুমি?'

'এই তো।' ঘনিষ্ঠ হয়ে আসে তাইজ্যা। আত্তির মাথাটা চেপে ধরে রাখে বুকের সমতলে।

'তাজু ভাই, আমি মইরা যামু তাজু ভাই, এই ঘরে আটকা থাইকা থাইকা আমার দম বন্ধ হইয়া আইছে। তুমি আমারে লইয়া যাও। দূরে কোন বনজঙ্গল পাহাড়ে পর্বতে লইয়া যাও।'

কথার জনাব দেয়না তাইজ্যা। নীরবে আত্তির বুকে পিঠে আঙ্গুল বুলাতে থাকে।

এক সময় একটা অদ্ভুত ইচ্ছা চাড়া দিয়ে ওঠে ওর মনে। ধুতরার গোটা পিশে খাইয়ে দিলে কেমন হয় মাতবরকে? কিম্বা ঘন্টা ফুলের পাতার রস? না মরুক, ব্যাটা পাগল হয়ে উৎপাত শুরু করলে ওকে ছাড়ান দিবে আতরজান।

আবার ভাবে, দিমু গেইদ্যা মামুদ্যারে গলা টিপা খতম কইরা। রাইতে উঠানে বাইর হইলে আমি আর হাইশ্যায় ধইরা মাটিতে ফালাইয়া দিমু গলায় পাড়া দিয়া দম শেষ কইরা—

একটা হুতোম পেঁচা ডেকে ওঠে ঘরের চালে। ভুত ভুতুম ভুত ভুতুম। অমঙ্গলের লক্ষন। আঁতকে ওঠে যেন আতরজান। নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় তাজুর গাঢ় বেষ্টন থেকে।

এক পা পিছিয়ে দাঁড়ায় মাথা হেঁট করে।

'কাইল আবার আসুম? এই জায়গায়?' ফিসফিস করে বলে তাইজ্যা।

অন্ধকার ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায় আতরজান। পায়ের নখ দিয়ে মাটি খুঁটতে থাকে। অনেক দিন পর খালি পায়ে নেমেছে মাটিতে। এতকাল খড়ম বা চটি ছাড়া চলতে দেয়নি মাতবর। আরাম বোধ করে শীতল ভুমির স্পর্শে।

নিঃশব্দে অন্ধকারে মিলিয়ে যায় তাইজ্যা। তখনো একঠায় দাঁড়িয়ে আছে আতরজান। চালের মাথায় ডেকে যাচ্ছে হুতোম পেঁচা। পেঁচা তো নয়, তারা বানুর সঙ্গের পেত্নীটা। ওটা যদি ভর করে এসে, তাহলে? ভয়ে গা কাঁটা দিয়ে ওঠে।

সারাদিন কঠিন অস্বস্তিতে কাটে তাইজ্যার। কখন সন্ধ্যা নামবে, কখন রাত হবে, আঁধারে ডুবে যাবে চরাচর, আতরীর ঘরের সামনে টানা উঠোনটায় ওকে কেউ ঠাহর করতে পারবে না।

'কই যাসরে তাইজ্যা?

ঘুমোয়নি তখনো হাসেম। চিৎ হয়ে শুয়ে পায়ের ওপর পা তুলে হাতে পাকানো চুরুট টানছিলো। তারা বানুর শিশু সন্তানটা মরা পয়দা হওয়ার পর থেকে কেমন গম্ভীর হয়ে গেছে। কথা বলেনা তেমন, নীরবে নিজের কাজ করে যায় সারা দিন।

'পগারে। খেশারি ডাইল খাইয়া পেটে বিষ করতে আছে।'

উত্তর শুনে কিছু আর বলে না হাশেম। নিঃশব্দে অন্ধকারে হাঁটু নাচাতে থাকে।

আজ আর টিনের বেড়ায় টোকা দিতে হয় না। আতরী চুপচাপ দাঁড়িয়ে ঘরের সামনে। অন্ধকারেও ওর ছায়া চিনতে পারে তাইজ্যা।

'আতু মনি। আতু সোনা।'

হাত বাড়িয়ে আতিকে জড়িয়ে ধরে তাইজ্যা। সমস্ত শরীর দিয়ে আগুনের ফুলকি বেরোচ্ছে ওর। হাত পা'র তালু যেন পুড়ে যাচ্ছে ভাপে।

'আত্তিরে ও আত্তি।' আবেগে গলা জড়িয়ে আসে। অস্থির হাতে খুঁজতে থাকে আতরীর মুখখানা। ওর উত্তপ্ত গালে নাক ঘসতে থাকে ছোট্ট শিশুর মত।

'আতু। চল্ আমার পলাইয়া যাই এই দেশ ছাইড়া। দিনাজপুরের শালবনে বাঘ ভাল্লুকের লগে গিয়া ঘর বানাই।'

'হুঁ।' কোন দূর সমুদ্রের ওপার থেকে যেন উত্তর দেয় আতরজান।

'তোরে ছাড়া আমি বাচুম না। তুই ছাড়া দুনিয়ায় আমার কেউ নাই। মাতবরে খালি বকাবকি করে। বাপ মা তুইলা গাইল দেয় খালি। চল্ আমরা নিরুদ্দেশ হইয়া যাই দুইজনে।'

তাইজ্যার কাঁধে শিথিল মাথা রেখে দাঁড়িয়ে থাকে আতরী। বুক চিরে ধীর তালে দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ছে ওর।

অনেকক্ষণ থেমে থেকে টেনে টেনে বলে, 'তাজু ভাই। পালাইয়া যামু ক্যান? বুড়ার তো আর বেশী বাকী নাই। কয়দিন আর বাঁচবো? রাইতে হাঁপানি জোর করলে ঘুমাইতে পারে না। দম টানতে থাকে চোখ মুখ টানা দিয়া। মাতবরের বুকের ভিতর ঘড়ঘড় করে ঘুমাইলে। এমন ডর লাগে না আমার আন্ধারে হের পাশে শুইয়া।'

'তয়?'

'তয় বেশী দিন নাই আর মাতবরের। জমি জমা সব লিইখা দিতে আছে আমারে। জানো না তুমি, চাড়াইল্যার দীঘিটা—'

'হ শুনছি, দীঘিটা তোর নামে কবুলিয়ত কইরা দিছে।'

'হ। বুড়া মরলে সবই তো তোমার হইবো। চরের নতুন জমিও হগল দিবে কইছে মামলা জিত্তা আইলে। ভাইবো না তুমি। সবর করো তাজু ভাই। কয়টা দিন আল্লা আল্লা কইরা পার করো।'

'তারপর কি করুম?'

'কি করবা? বুড়া মরলে মৌলবীরে ডাইকা—'বাকী কথা শেষ করে না আত্তি। অন্ধকারে মৃদু হাত বুলোয় তাইজ্যার পিঠে।

বারো

রসুই ঘর থেকে খাবার টেনে এনে শীতল পাটি পেতে রোজকার মত দুপুরের খাওয়া খাইয়েছে মরনির মা। পালঙ্কে উঠে গিয়ে বিছানায় গড়াগড়ি দিচ্ছে আতরজান। মুখে একটা এলাচদানা।

চোখ লেগে এসেছিলো বুঝি। হঠাৎ বাইরের উঠোনে হাঁক ডাক গেদু মাতবরের। সদর কাচারি থেকে বাড়ি ফিরেছে মাতবর।

'কই তোরা সব? বাইর হইয়া আয়। ও মরিয়ম, দেখ নানায় কি আনছে তোর লাইগা। ও রহিমা, রমু মা, উঠানে আয় মাজান।'

মরিয়মের সঙ্গে কথা বার্তা হলেও রহিমার অস্তিত্ব যেন ভুলেই গিয়েছিলো গেদু মামুদ আতরজানকে বিয়ে করার পর। নিজের মেয়ের চেয়ে ছোট। তার ওপর কাজের মেয়ে। হয়ত একটু সঙ্কোচও ছিলো মনে। আজ হঠাৎ আদরের সঙ্গে ডাকতে থাকে মেজো ঘরের বড় কন্যাকে।

'মজুর মা, রমুর মা, রায়হানের মা—আসো. সবাই উঠানে নাইমা আসো। তোমাদের জন্য দেখো কততো জিনিস আনছি।'

উৎসাহে উঠোনময় পায়চারি করতে থাকে মাতবব।

আজ অনেক দিন পর ডাক পড়ে বড় মেজো আর সেজো স্ত্রীর। ওদের ঘরে যাওয়া দূরে থাক, দুটো সখ দুঃখের কথাও বলেনি মাতবর দিনের পর দিন। খাও দাও সংসারের কাজ করো, রাত হলে যে যার ঘরে গিয়ে ঘুমোও। এটাই যেন নিয়ম হয়ে গিয়েছিলো মাতবর বাড়িতে।

একমাত্র ব্যতিক্রম শুধু আতরজান। যত গল্প আলাপ, যত আদর সোহাগ সব ছোট বিবির নতুন সংসারে।

ধীর পায়ে নেমে আসে স্ত্রীরা। মাথায় ঘোমটা তুলে দিয়ে। কৌতুহল ছোট ছেলে মেয়ে নাতনাতনিদের চোখে মুখে।

মোটাসোটা গাট্টি খোলে মাতবর, 'মামলা জিতছি। দুই দিনেই সিকদারের দায়দাবী ডিসমিস। তোমাগো লাইগা শাড়ি কাপড় কোর্তা

জামা বেলাউজ টুপি—হাতের কাছে যা পাইছি সব আনছি। যার যেইটা পছন্দ, নিয়া নাও।'

খুশীতে দাড়িতে আঙ্গুল দিয়ে কাঁকই চালায় মাতবর। যোবেদার দিকে চেয়ে বলে, 'বাপ জানরে ঠাণ্ডা পানি খাওয়াও দেখি মা। একটা পাঙ্খা আইনা বাতাস করো কেউ, একদম হয়রান হইয়া গেছি দুই তিন দিনের দৌড়াদৌড়িতে।'

খুশী খুশী ভাবটা তুঙ্গে চড়ে যায় জামা কাপড় শাড়ি বলাউজের ওপর ছেলে মেয়েদের হুমড়ি খেয়ে পড়া দেখে, জানতাম আমি আগেই, নরেন উকিলের হাতে যে মামলা পড়ছে সে মামলায় কোনদিন হার নাই। দলিল দাখিলা পরচা খতিয়ান সব বাইর করছে উকিল বাবু কোর্ট কাচারি ঘাইটা, এমন সব রেকর্ড দেখাইছে না, জজ সাব তো টাববুস। কুর-কুরু মামুদের সময় জোতজমা নদীতে ভাঙতে শুরু করছে। বেঙ্গা মামুদের সময় ভাঙছে, ইসবের সময় ও ভাঙছে। আর এখন গেদু মামুদের জমানায় ভাঙ্গা পলি গিয়া চর হইয়া ভাইসা উঠছে দরিয়ার মাঝ খানটায়। কপাল ফিরাইয়া দিছে খোদাও ন্দতালায়।'

কথা বলতে বলতে দৃষ্টি পড়ে আতরজানের দিকে। এতক্ষণ ফাতেমা বিবির পেছনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলো শাড়ীর খুট ঠোঁটের নীচে চেপে ধরে।

'আতু, আতুবিবি, তোমার ভাগ্যে কপাল খুইলা গেছে মাতবর বাড়ির। তুমিও আইছো, এততো বড় চর আইসা গেছে গেদু মামুদের দখলে।'

সরম পায় যেন আতরজান মাতবরের উচ্ছ্বাসে। দু'পা পেছনে সরে দাঁড়ায়। মাথা নীচু করে বিড় বিড় করে ফোড়ন কাটে যোবেদা। ঘাগরা ছেড়ে মাত্র শাড়ি ধরেছে, 'বাজানের মাথার ঠিক নাই। আত্তির আহনের লগে চর কেমনে পাইলা তুমি বাজান? হে ধান কর্জ করতে আইছেনা এই বাড়ীতে সাত আট বছর আগে, আমরা যখন গেদা আছিলাম? ফকীরনী থেইকা রাজরানী। আছিলা বান্দী, এখন পিন্দো সোনাচান্দি। ধলা পেত্নিটা কি এই বচ্ছর আইছে মাতবর বাড়িতে?'

হইচইয়ের মধ্যে যোবেদার কথাগুলো কানে যায় না কারো।

হাতে একটা ছোট মোড়ক। ওটা উঠানে খোলেনা গেদু। বগলের নীচে ধরে রাখে।

উচ্ছ্বাসের ধাক্কা কমে এলে নতুন ঘরে এসে ঢোকে। পেছনে পেছনে আতরজান।

'দেখো আতু মনি, কি আনছি আমার জানের লাইগা।'

পুটলিটা বিছানার ওপর মেলে ধরে মাতবর। ভেতরে এক গাদা রং বেরংয়ের শাড়ি, ব্লাউজ, পেটিকোট, চটি। রুমালে বাঁধা যত সব সুরমা কাজল স্নো ক্রীম পাউডারের শিশি বোতল।

'আরো আনছি, আরো জিনিস আনছি তোমার লাইগা ছোট বেগম।'

বলেই সাইড পকেট থেকে দুটো প্যাকেট বের করে আতরীর চোখের সামনে মেলে ধরে মাতবর। সুন্দর ভেলভেট কাপড়ের কৌটায় সোনার যত গয়না। মনিমুক্তো বসানো অলঙ্কার সব ঝলমল করে ওঠে মৃদু আলোতে।

ঝুঁকে পড়ে চোখ বড় বড় করে দেখে আতরজান, 'ইস এতগুলা! এত জেওর! কত পিন্দুম আমি?'

'কইছিনা তোমারে, সোনা দিয়া মুইড়া দিমু আমার আদরের আতুজান রে। এক পাল্লায় তুমি ছোট বউ, আরেক পাল্লায় সোনার চাক্কা। কাঁচা সোনার যততো জেওর।'

খুশীর ঝিলিক আতরীর চোখে মুখে। বাইরে উঠোনে নতুন জামা কাপড় পেয়ে হইচই করছে বাচ্চারা। টানাটানি করে দেখছে একে অপরেরটা।

'খিড়কিটা বন্ধ কইরা দেই? কেউ যদি উঁকি মাইরা দেইখা ফালায়। যোবেদাটা খালি ঘুরঘুর করে আমার ঘরে আইজকাইল। এইটা নাড়ে, ওইটা নাড়ে যোবেদাটা। যোয়ান বেডির হায়া শরম নাই একটুও।'

'হ। খিড়কি দরজা বন্ধ কইরা দেও।' মিটিমিটি তাকায় মাতবর।

'হাত মুখ ধুইবেন না? ভাত খাইবেন না?'

'খামু। আগে তোমার গালে চুমা খাইয়া লই জান ভইরা, হের পরে ভাতপানি।'

মাঘের শীতে বাঘও কাঁপে। উত্তরের পাহাড় থেকে কনকনে হাওয়া বইছে। সন্ধ্যার পর গা কাঁপা দিয়ে জ্বর এলো গেদু মাতবরের।

বুকের ভেতর দম আটকানো ব্যথা। হাঁপানির তোড় বেড়ে গেলো হঠাৎ করে।

সারা দিন চাড়াইল্যার পুকুর পাড়ে কাটিয়েছে। কাওন আর চীনা ধানের চাষ করেছে দীঘি থেকে পানি সেচ করে। এক দঙ্গল কামলার কাজের তদারকি করেছে সন্ধ্যাতক। দুপুরের খাওয়াটাও হয়নি।

বাড়ি ফিরে এসে সটান শুয়ে পড়লো লম্বা হয়ে। কঁকাতে লাগলো ব্যথায়।

'আতু, তুই কই গেলি ?'

'এই তো আমি। আপনের পায়ের কাছে।'

স্বামীর পায়ে আস্তে আস্তে হাত বুলচ্ছে আতরজান।

'আয়, আমার কাছে আইসা বস, মাথার কাছে আইসা বুকটা হাতাইয়া দে। বড় কষ্ট হইতে আছে।'

'দাঁড়ান। সরিষার তেলের লগে রসুন ছেঁইচা গরম কইরা আনি। মালিশ কইরা দিলে আরাম পাইবেন। ছোট থাকতে একবার নিমুনি হইছিলো, নানী আমারে মালিশ দিয়া ভালা করছিলো।'

বলেই উঠে যায় আতরজান। অনেক দিন পর রসুই ঘরে গিয়ে তেল রসুন গরম করে আনে। বুকের জামা উদোম করে মাতবরের। তারপর নীচু হয়ে ঘসতে থাকে।

আরাম পেয়ে চোখ বুঁজে থাকে বুড়ো। বুকের ঘড়ঘড়ানির উপশম হয় যেন।

এক সময় ধীরে ধীরে বলে, 'ছোট বউ।'

'কি ? গরম দুধ খাইবেন এক বাটি ? নিয়া আসি ?'

'না। এখন খামু না কিচ্ছু। তুই আমার বুকের উপর মাথা রাইখা শুইয়া থাক। আমারে জড়াইয়া ধইরা রাখ। আমার খালি ডর করে—'

'ডর কিসের ? এইতো কাইল বিহান তক ভালা হইয়া যাইবেন, সিং মাছের শুরুয়া দিয়া গরম ভাত খাইবেন।'

ডর!' অনেক দূর থেকে যেন বলে গেদু মামুদ, 'আমার সময় আর বেশী নাই ছোট বউ। কবরে ডাকতে আছে।'

আঁতকে উঠে যেন আতরজান, 'আপনে চইলা গেলে আমার কি হইবো ? মাইজা জয়নাইল্যা সুলতাইন্যা—আপনার জোয়ান জোয়ান

পুতেরা আমারে থাকতে দিবো এই বাড়িতে? কইবো না, ফকিরনীর মাইয়া ফকিরনী, আমাগো বাড়ি ছাইড়া বাইর হও এই বেলা।'

কি যেন চিন্তা করে মাতবর, 'ভালা হইয়া উঠি, সদরে গিয়া নতুন চরের মামলার রায়ের নকল বাইর করুম জজ কোর্ট থেইকা। রায় লইয়া সাবরেজিস্ট্রি অফিসে যামু। পুরা চরটা তোমার নামে সাফ কবলা কইরা দিমু। কইছিতো তোমারে, পুরা চরটাই পাইবা। তোমার নামে চরের নাম রাখুম চর আতরজান। চর আলেকজাণ্ডার, চরজাব্বর, চর ফেশনের মতন চর আতরজান।'

'না না।' মৃদু লাজুক হাসি আতরীর, 'আমার নামে নাম রাখবেন ক্যান? মাইয়া মানুষের নামে বুঝি চরের নাম হয়। রাখবেন মাতবরের চর। আপনের নামের লগে মিলাইয়া গেদু মাতবরের চর।'

'না। আমার নামে না। তোর নামেই নাম রাখুম নতুন চরের। আমার আতরজানের চর।'

বুড়োর উদোম বুকে নাক ঘসাতে থাকে আতু বিবি, 'জমিজমা তো দিলেন, কিন্তুক থাকুম কই? একলা থাকুম চাড়াইল্যার দীঘির পাড়ে? ভুত প্রেতের ভয়ে মইরা যামুনা?'

'দীঘির পাড়ে যাইবা ক্যান তুমি? এই বাড়িতেই থাকবা। তোমার ঘরেই থাকবা তুমি। দিমু, এই বাড়ির চাইর আনি শরীকও তোমারে লেইখা দিমু।'

আতরীর মাথায় হাত বুলোয় মাতবর, 'খুশী হইছো এইবার? কও কোন বেইনসাফি করছি তোমার উপর?'

'না।' নিশ্চিত বোধ করে আতরজান, 'সদরে একলা যাইয়েন না। তাইজ্যারেও লগে নিয়েন। একলা আপনেরেব ছাড়লে আমার কলিজার ভিতর থাবুত থাবুত করে। কাগজ পত্র তাইজ্যারে বুঝাইয়া দিয়েন। মক্তবে দুই কেলাস পড়ছে তো ছোটকালে।'

'আচ্ছা।'

এক সময় উঠে গিয়ে গ্লাস ভরে মিশ্রির সরবত নিয়ে আসে আতরজান। ঘাড়ের নীচে হাত রেখে মাতবরের মাথাটা তুলে ধরে, ,নেন। সরবতটুকু খাইয়া ফালান। বার্লি বসাইছে মরনির মা। পরে গরম বার্লি খাইয়া ঘুমাইবেন।'

যত্ন আর বিশ্রামে কিছুটা সুস্থ হয়ে ওঠে মাতবর। পিঠের নীচে বালিশ পেতে উঁচু হয়ে বসে, 'বউ, বাত্তিটা উসকাইয়া দেও।'

'ক্যান? কি করবেন?'

'তোমারে দেখুম। তোমার দুধজোড়ার সোনাবরণ দেখতে খুব ইচ্ছা করতে আছে।'

'দেখবেন? তয় জেওর সব পিন্দা আসি?'

'কই যাইবা পিন্দতে? এই খানেই পিন্দো।'

'সবগুলা তো লোহার সিন্দুকে। আর—'মুখ গম্ভীর হয়ে ওঠে আতরীর, 'আর সেইটা তো আপনের বড়জনের ঘরে। জিনিস আমার, মালিক মইজ্যার মা।'

'আগে কও নাই ক্যান কথাটা? দুইনাদারির তরাদ্দুদে আমার মনে থাকে এতো কথা? কাইলই তাইজ্যারে কমু কামলা মুনি দিয়া টানাটানি কইরা তোমার ঘরে নিয়া আইতে। আমার দাদা বেঙ্গা মাতবরের কালের সিন্দুক, আগুন পানি কিচ্ছু ঢুকতে পারেনা ভিতরে। চারটা চোরা চাবি লাগে খুলতে।'

খুশীতে মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে আতরজানের, 'চাবি তো থাকবো বড় বুবুর কাছে, কি কন?'

'ক্যান? সিন্দুক তোমার ঘরে। চাবিও তোমার কাছে থাকবো। হে গো জেওর পাত্তিও তোমার কাছে রাখবা। বিয়াশাদী ঈদে পর্বে নিয়া পিন্দবো, কাম শেষ হইলে দিয়া যাইবো, উঠাইয়া রাখবা।' একটু থেমে বলে: 'জমিজমার দলিলপত্র ওতো সব সিন্দুকে। হেইগুলাও তোমার হেফাজতে থাকবো।'

সেরেও সেরে ওঠে না গেদু মামুদ। দু'দিন হাঁপানির জোর কমে তো তিন দিনের মাথায় বেড়ে যায়। দিনের বেলা উঠোনে পাটি পেতে শুয়ে থাকে। রাত হলে ঘর কাঁপিয়ে খুকুর খুকুর কাশতে থাকে।

ছায়ার মত মাতবরের পাশে পাশে আতরজান। মাঝে মাঝে আপন মনে লোহার সিন্দুক খুলে নতুন শাড়ি পরে, অলঙ্কারে ঝলমল করে দোহারা শরীর। শাড়ির আঁচলে এক গাদা বড় বড় চাবি। ঝুনঝুন ঝুনঝুন শব্দ হয় চলার তালে তালে।

এতদিন পরে নিজেকে দারুন গৃহিনী মনে হয় আত্তির। চাবির ঝনঝনানি যেন তার স্পষ্ট প্রমাণ। কখনো কখনো উঠানে নেমে হাঁটে আপন মনে। পেছনে ওর মরিয়ম। ছোট নানীকে খুশী করার চেষ্টা ওর খুব। প্রসন্ন হলে সিন্দুক খুলে গয়নাপাতি দেখাবে, নেড়ে চেড়ে দেখতে দেবে। এক আধটু গলায় পরে আয়নায় মুখ দেখার সুযোগ পাবে।

মাঝে মাঝে পগার থেকে ডুমুর কি কাউফল কি ডেউয়া পেড়ে আনে মরিয়ম আকশি দিয়ে। লবণ মরিচ মেখে চাটনি বানায়। বাটিতে করে এনে বলে, 'খাইবা ছোট নানী? খুব ঝাল কিন্তুক।'

হাতের চোটায় তুলে নিয়ে চাখে আতরী। হেসে বলে, 'তুই এত খাইস না মরিয়ম। পেট ছুটবো কিন্তুক।'

আতরীর পিঠে মৃদু ধাক্কা মারে মরিয়ম, 'তুমিও বেশী খাইওনা নানী। তোমারও পেট ছুটবো।'

হঠাৎ একদিন মাতবরকে ধরে বসে আতরজান, 'আপনে আমারে নতুন চরটা হেবা কইরা দিলেন দেনমোহর হিসাবে। কিন্তু দেখাই-লেন না কোন দিন? যাইবেন বেড়াইতে চরে আমারে লইয়া?'

'ইস্ এতদিন কও নাই ক্যান ছোটো। লইয়া যাইতাম কোসা নৌকায় কইরা। চাঁদনী রাইতে বেড়াইতাম দুইজনে। এখন তো আমার হাঁটবার আর শক্তি নাই। দশ কদম গেলেই শ্বাস উঠে। দেখতেই পাইতে আছো, সিনার হাড্ডিগুলা কেমন ঠেইলা উঠছে। দিন আর বেশী নাই ছোট বউ। তোমারে একটা পুত যদি দিয়া যাইতে পারতাম—'

বাক্যটা শেষ করতে পারেনা মাতবর। সঙ্কোচে মাথা নীচু করে থাকে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আতরী, 'চেষ্টা তো কম করেন নাই আপনে। ক্ষ্যামতায় না কুলাইলে কি করবেন। যখন শক্তি আছিলো, তখন তো' —আঙ্গুলে গণনা করে আতরজান, 'তখন তো বড় বু আর মাইজ্যা বুর ঘরে মোট সতেরোটা পয়দা করছেন।'

'হ রে আতু, তোর জমানায় গেদু মাতবর আটকুড়া হইয়া গেলো। তুইও কলেমা পড়া বিবি হইলি, আমারও তাকত সব শেষ হইয়া গেলো। তোরে এত সিজ্জত শাস্তি না দিলেই পারতাম এতটা কাল। আগুনই জ্বালাইছি তোর সোনা অঙ্গে; নিভাইতে পারি নাই কোন রাইতে।'

প্রসঙ্গটা প্রীতিকর মনে হয়না আতরীর। কথা ঘোরায়, 'হাঁইটা যাইতে না পারেন, চলেন পাল্কিতে চইড়া যাই। নদীর ঘাট তক। বাকীটা নাও চইড়া। এক পাল্কিতে আমি, আরেকটায় আপনি। চাঁদনী উঠন তক চরের পাড়ে বইসা থাকুম দুইজনে। এক জোড়া কেঁথা লইয়া যামু লগে, ঠাণ্ডা লাগলে গায়ে মোড়াইয়া বসবেন। কি কন?'

তেরো

চৈত্রের কঠিন খরা। ধুধু করছে মাঠঘাট। খাল বিল সব শুকিয়ে কাঠ। লু হাওয়া বইছে যেন নদীর দিক থেকে।

হালের গরু আর দুধের গাই দুটো মাঠে ছেড়ে দিয়েছে। নিড় কোদাল দিয়ে শুকনো বাদামী রংয়ের দুর্বা উঠাচ্ছিলো তাজু আর হাশেম। ঘামে গোসল হয়ে গেছে, পিঠ যেন পুড়ে যাচ্ছে রৌদ্রের তাপে।

'আর একটু জিরাই।' টুকরিতে জড়-সর্বস্ব ঘাস উঠাতে উঠাতে বলে হাশেম, 'হালার কপালটাই মন্দ। সেই ছোট বেলা থন গোলাম খাইটা গেলাম মাতবরের বাড়ি, এক রত্তি সুখের মুখ দেখলাম না কোন দিন।'

'হ হাশেম ভাই।' গামছা দিয়ে গায়ের ধুলো ঝাড়ে তাইজ্যা।

'কপাল হইলো আত্তিটার। রূপ দেখাইয়া কেমন বশ কইরা ফালাইলো মাতবররে। ফুসলাইয়া একদম ছোট বিবি। জমিজমা অর্ধেক।'

'তুমি মাইয়া লোক হইলে তুমিও পটাইতে পারতা। আল্লায় তোমারে তো মরদ বানাইয়াই তোমার কপালটা খারাপ করছে।'

রসিকতা করে তাইজ্যা।

'পুরুষ লোক আর মাইয়া লোক, সেইটা বড় কথা না। তারা নানীও তো মাইয়া ছেইলা, বুড়া হার্মাদ দিছে কিছু হেরে? হগল তো সব আত্তির নামে। চাড়াইল্যার দীঘি, নতুন চরের জমি—একে একে হগল সাফকবলা কইয়া দিছে রঙ্গিলা বিবিরে।'

'বসত বাড়ির চাইর আনিও দিছে। শোনো নাই?'

'আচ্ছা! জানতামনা তো। বুড়ার দম ফুরাইলে কইলাম, ইদ্দতের সময়টাও দেরী করবো না আত্তি। জমিজমার লোভ দেখাইয়া

কোন যোয়ান মর্দরে পাকড়াও করবো। দেখবি কোন চাষাভুষা আইনা উঠাইবো মাতবরের ভিটায়।' ঘাসের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বলে যায় হাশেম, 'আর বেচারী তারা বানু। একটা পোলা মাইয়া থাকলেও না হয় মাটি কামড়াইয়া পইড়া থাকতো। কই যাইবো রাঁড়ি হইয়া সাইজ্যা নানীটা?'

'তুমি লইয়া যাইও সাঙ্গা কইরা। কি কও?' কৌতুক করে তাইজ্যা।

'ফাজিল কথা রাখ। পেট পালনের জোগাড় নাই আমার, চেটের চিন্তা করুম কি দিয়া? বুড়া হালায় যদি দুই কানি জমিও লেইখা দিতো তারারে—।'

হাশেমের কথায় কান দেয় না তাইজ্যা। আতরজানের নামে কি পরিমাণ সম্পত্তি লিখে দিয়েছে, বছরে কত মণ ধান হবে তাতে, কত টাকার মাছ বিক্রি করতে পারবে চাড়াইল্যার পুকুরে, তার হিসেব কষতে থাকে মনে মনে।

ক্ষেতের আলে পা মেলে দিয়ে ভাবে, 'মাতবর যে ভাবে শুকাইয়া যাইতে আছে, চাটাইর লগে মিশা যাইতে আছে পেটে পিঠে, সময় আর বেশী বাকী নাই। কাশির জোরও কইমা গেছে। জোর নাই আর গলা ফাটাইয়া কাশনের।'

মাতবরের অনুপস্থিতিতে সেই যে দুবার রাতে দেখা হয়েছে আতরীর সঙ্গে, তারপর তো আর একটা মুহূর্তের জন্যও কাছে পায়নি ওকে। একটা ছোট্ট কথাও হয়নি। দূর থেকে উঠোনের তরজার ফাঁক দিয়ে দু' একবার দেখেছে রসুই ঘরে খেতে, মরিয়মের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করতে। মাতবরের ভয়েই হয়তো ধরা দিচ্ছেনা এখন।

আঁচলের প্রান্তে আতরজানের এক গোছা চাবি। মাতবরের লোহার সিন্দুক ভর্তি কাঁচা টাকা। সে সিন্দুকের চাবি বুড়া তুলে দিয়েছে ছোট বিবির হাতে। আর এভাবে কামলা খাটতে হবেনা ওর, ওড়াকে ওড়া গোবর সাফ করতে হবেনা গরু ঘরে। ছয় মাস কি বড় জোর এক বছর টিকবে মাতবর। তারপরই তো—খুশীতে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠে তাইজ্যার।

'কি রে? কি ভাবতে আছস চুপচাপ?' কোদাল হাতে উঠে দাঁড়ায় হাশেম, 'চল, দুপরের আগে তো দুই কোরা ঘাস তোলা শেষ করতে হইবো।'

'বাজান। আমি আইছি বাজান।'

'কে? কেডা?' কোটরে বসে যাওয়া চোখ মেলে তাকায় মাতবর। বুক পর্যন্ত কাঁথা দিয়ে ঢাকা। মাথার কাছে হাত পাখা নিয়ে বসে আতরজান, বাতাস করছে ধীরে ধীরে।

'আমি মজু ·াজান। আবদুল মজিদ।'

'আইলি? এত কাল পরে বাড়ি ফিরা আইলি?' ক্ষীন স্বর গেদু মামুদের। মাথাটা এলিয়ে রয়েছে তেল চিটচিটে বালিশে।

চুপ করে থাকে মজিদ।

'লগে ওইটা কেডা? তোর কোলে?'

'আপনের নাতি।

চোখ বড় বড় করে চেয়ে আছে বছর দুয়েকের শিশু মরনোন্মুখ বুড়োর দিকে। ম্লান হাসে মাতবর, 'কি নাম? কি নাম রাখছস?'

'বদু মামুদ। আসল নাম বদিয়ুর রহমান।'

'বাহ্ সোন্দর নাম তো। গেদু মামুদের নাতি বদু মামুদ। বড় হইলে বদু মাতবর।'

মাথার পাশে কয়েকটা কমলা বুড়োর, 'ছোট বউ একটা কমলা দেও দেখি আমার হাতে।'

শীর্ন হাতে ফলটা তুলে নিয়ে উঠিয়ে দেয় নাতির মুঠোয়, 'খাও, বদু ভাই। দাদায় দেখি।'

কতক্ষণ থেমে থেকে বলে, 'বউ আইলোনা? বদুর মা?'

'না। যাত্রা পাটি ছাইড়া আইবোনা।'

নীরবে পিতাপুত্রের কথা শুনে যায় আতরজান। শক্ত হয়ে বসে থাকে। বাতাস করা হাত পাখাটা কখন থেমে গেছে। খুঁটির মাথায় ঝোলানো মাতবরের লাঠিটার দিকে চেয়ে থাকে। লাঠিতে ভর না দিয়ে পগারে যেতে পারেনা বুড়ো আজকাল।

মজিদ ছেলেকে নিয়ে বেরিয়ে গেলে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ে মাতবর অস্পষ্ট ভাবে বলে, 'পেটের ছেইলা। সেই ছেইলার টানেও আইলোনা মজুর বউ। আমিতো ছোট বউ তোরে একটা পুত দূরে থাক, একটা ঝিও দিতে পারলাম না। কিসের টানে তুই পইড়া থাকবি এইখানে?'

কথার জবাব দেয় না আতরজান। শাড়ির অঁচলে বাঁধা চাবির গোছাটা আঙ্গুলে মোড়াতে থাকে। মৃদু শব্দ হয় টুংটুাং।

গেদু মামুদের মৃত্যুর পর আজ দশদিন। বাড়ি ভর্তি এখনো মানুষ। বাপের শেষ অবস্থার খবর পেয়ে মেয়েরা সব এসেছে কাচ্চা বাচ্চা নাতি নাতনী নিয়ে। পাড়া প্রতিবেশীরাও আসে দুবেলা। উঠোনভর্তি ছোট ছেলে মেয়েদের হল্লা। বাইর বাড়ি, ঘাট, সবখানে মানুষের ভিড়। শোক প্রকাশ করতে এসে ফেরত যেতে চায়না আত্মীয় স্বজনরা কেউ। হাঁড়ি হাঁড়ি ভাত রান্না হচ্ছে হেঁসেলে।

এ কয়টা দিন একবারও ঘরের বাইরে আসেনি আতরজান। পেছন দিকের দরজা খুলে চুপচাপ বসে থাকে জলচৌকি পেতে। উদাস চোখে চেয়ে থাকে পগারের উঁচু উঁচু নারকেল সুপারি গাছের দিকে।

মাঝে মাঝে ঘরময় পায়চারি করে। চিরুনী হাতে আয়নার সামনে বসে থাকে কখনো কখনো। কিম্বা খাটে শুয়ে কড়িবর্গায় টিকটিকির ছুটোছুটি দেখে।

বড় বিবির সংসারের দায়দায়িত্ব নিয়েছে মজু মাতবর। বাপের বড় ছেলে। ঘরগেরস্তি সামাল দেবার ভার তো ওরই। বাইর বাড়িতে গেদু মাতবরের মতই হাঁক ডাক শোনা যায় মজু মিয়ার। কাজে ছুটোছুটি করে হাটবাজারে, মাঠের বাথানে। সৎ মা'দেরও খবরদারি করে ঠিকমত।

এতো ঝামেলার মধ্যেও একটুও স্বস্তি পায়না তাইজ্যা। উত্তেজনায় গলা শুকিয়ে যায়। বুকের ভেতরটা অকারণে ঢিপ ঢিপ করতে থাকে। খরগোসের মত কান খাড়া করে থাকে অন্দর মহলের দিকে। এই বুঝি কথা শোনা যাবে আতরজানের। উঠোনে ওর খড়মের আওয়াজ পাওয়া যাবে।

কিন্তু না। আতরীর অস্তিত্বই যেন নেই এ বাড়িতে। কখনো ফাঁক পেলে উঠোনের বেড়ার ছিদ্র দিয়ে উঁকি দেয় তাইজ্যা। সবাই হাঁটাহাঁটি করে, কথা বলে এ ঘর থেকে ও ঘরে যেতে যেতে। কিন্তু আতরজানের কোন সাড়া নেই কোথাও।

আরো দিন যায়। আশায় আশায় রাত জাগে তাইজ্যা। উঠোন পেরিয়ে আতরজানের দরজায় গিয়ে টোকা দিতে সাহসে কুলোয় না।

মজু মাতবর এখন বাড়ির বড় কর্তা। কিছু একটা টের পেলে সর্বনাশ বাঁধিয়ে বসবে।

চল্লিশা হয়ে যায় গেদু মামুদের। চার পাশের গ্রামের যত ছেলে বুড়ো, আত্মীয় স্বজন সবাইকে দাওয়াত দিয়ে জেয়াফত খাওয়ায় মজিদ। চার চারটা গরু, দশ মণ চাল, হাঁড়ি কে হাঁড়ি দই— সোরগোলে ভরে যায় সারা মাতবর বাড়ি।

মরনির মা পায়ের কাছে বসে চুল বিলি করে দেয় আতরজানের। 'কতকাল আর এমন ভাবে মন খারাপ কইরা থাকবি? যে জন গেছে, সে কি আর ফিরা আইবো? বাড়িতে কত মানুষ। হে গো লগে দুঃখ সুখের দুইটা কথা কইলে বুকটা হালকা হইবো।'

কথার জবাব দেয় না। আঙুল দিয়ে পায়ের নখ খোটে আতরজান।

'তাজু কয়, ছোট নানীটা শোকে পাথর হইয়া গেছে গো মরনির মা। মাতবোল নাই একদম। নিজের ঝিপুতেরা ভুইলা গেছে বাপে রে, সংসারে মন দিছে হগলে। কিন্তু নানীটা তো বোবা হইয়া গেলো।' দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে মরনির মা, 'তাইজ্যা তোমারে দেখতে আইতে চায়। কয়, ছোট নানীরে—'

এতক্ষণ পর মুখ খোলে আত্তি, 'না। ইদ্দত পার না হইলে আমি কারো লগে দেখা করুম না। ঘরেই পইড়া থাকুম।'

ওর থমথমে গম্ভীর মুখ দেখে আর কিছু বলতে সাহস পায় না মরনির মা।

এ কি কঠিন অস্বস্তি। ডাঙ্গায় তোলা মাছের মত রাতভর ছটফট করতে থাকে তাইজ্যা। দিন তো কেটে যায় কোন মতে কামকাজে। রাতে একলা গিয়ে মাঠের নামায় হাঁটাহাঁটি করে। গরু ঘরে উঁকি মেরে জানোয়ারগুলোর জাবর কাটা দেখে, পুকুর পাড়ে ঝিঁঝি পোকার একটানা ডাক শোনে।

ইদ্দত না কি যেন বলেছিলো মরনির মা। সে সময়টা পার হয় না কেন আতরীর? কেন ডাক পড়েনা ওর? কেন নতুন ঘরের পেছনে রাতের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বলে না, 'তাজু, আমি এখন খালাস সব ঝামেলা থন। তুই সব ঠিকঠাক কইরা আমারে লইয়া যা। চাড়াইল্যার দীঘির পাড়ে একটা ছাপরা তুইলা দুইজনে—'

ভাবতে ভাবতে কখন যে আতরজানের ঘরের পেছনে এসে পৌছেছে, টের পায়নি তাইজ্যা। ওপরে আবছা আকাশে মিটিমিটি জ্বলে উঠেছে শুকতারা। রাত শেষ হয়ে এসেছে।

মৃদু টোকা দেয় বেড়ায়। আগের মত।

কোন সাড়া নেই। চুপচাপ অপেক্ষা করে।

আবার টোকা। এবার একটু জোরে। থেমে থেকে আরো জোরে।

কি এমন গাঢ় ঘুমে অচেতন আতরী যে, টের পাচ্ছেনা তাইজ্যার সঙ্কেত? এত মড়া ঘুম ঘুমায় নাকি মানষে সারা রাত? ভোরে হবেনা এক ঘড়ি পরে? এখন তো ঘম পাতলা হয়ে ওঠা উচিত।

এবার এগিয়ে গিয়ে দরজায় আরো জোরে টোকা দেয়। গলা খাকারি দেয় নীচু স্বরে।

'কে? কেডা? কেডা বাইরে?'

মরনির মা জেগে উঠেছে। হারিকেন বাতি উসকে দিয়েছে। আলোর রেখা আসছে বেড়ার ফাঁক দিয়ে।

দম বন্ধ করে পা চালিয়ে পগারের দিকে সরে যায় তাইজ্যা। গাছের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায় চোখের পলকে।

সামনে খন্দ। আমন ধান কাটার ভরা মওসুম। এবার খুব ভাল ফলন। মাঠকে মাঠ ধানের বাহার। কামলা বদলাদের ব্যস্ততার শেয নেই।

মজু মাতবরের নতুন ব্যবস্থা অনুযায়ী আতরীর শরীকে তাইজ্যা আর তারা বানুর শরীকে কাজ করে হাশেম। উদ্যমের শেষ নেই হাই-শ্যার। সারা দিন মাঠে কাজ করে, সন্ধ্যায় এসে ঝাকি জাল দিয়ে মাছ ধরে, কাচারি ঘরের দাওয়ায় বসে ডোল বোনে ধান তোলার জন্য।

খাবার সময় ডাক পড়ে হাশেমের। হাতিনা ঘরে পিড়ি পেতে খেতে দেয় তারা বিবি। টিনের গ্লাসে করে পানি এগিয়ে দেয় পর্দার ওপাশ থেকে। হাট বাজারের দরদাম জিজ্ঞেস করে।

'কি রে তাইজ্যা, অমন মুখ কালা কইরা বইসা রইছস ক্যান? মনে হয় য্যান বাপ মরছে তোর?

কাচারির উঠোনে গরুর দড়ি পাকাতে পাকাতে বলে হাশেম।

ম্লান হাসে তাইজ্যা, 'বাপ তো মরছে ঠিকই, তয় এখন না, সেই দশ

বচ্ছর বয়স কালে। গায়ে জ্বর জ্বর লাগতে আছে। তাই চুপ কইরা বইসা রইছি। ভাত খাইছো?'

'এইতো খাইয়া আইলাম। যা মজা কইরা চেদুরী মাছ রাঁধছে না তারা বিবি। দারুণ রাঁধতে পারে। তুই খাইবি না?'

'না। থামুনা এই বেলা। মুখে স্বাদ নাই একটুও।'

বলেই উঠে যায় তাইজ্যা। হাইশ্যার সংসর্গটা কেমন যেন অসহ্য মনে হয়। গেদু মাতবরের মরনে ফুর্তি বেড়ে গেছে যেন। কি রকম কুদে কুদে কাজ করে সারা দিন। পীরিত যেন নতুন করে জমে উঠেছে তারা বিবির সঙ্গে।

কাচারি ঘরের ভেতর ঢুকে চাটাই পেতে শুয়ে পড়ে তাইজ্যা। আতরজানের দেওয়া নকশিতোলা চাটাইটা জায়গায় জায়গায় ছিদ্র হয়ে গেছে। একটা ময়ূরের মাথার স্থানটায় বেত ছিঁড়ে গেছে। ছিদ্রটা খোটে কাত হয়ে শুয়ে। সন্ধ্যাতক শুয়েই থাকবে আজ। উঠবেনা বাকী দিনটা।

'ওই তাইজ্যা উঠ্ উঠ্। হাইঞ্জ্যা বেলা মরার লাহান ঘুমাইতে আছস্ ক্যান? কি হইছে তোর?'

বাঁশের একটা কঞ্চি দিয়ে পিঠে খোঁচা দিতে থাকে মরনির মা, 'উঠ্ উঠ্। রাইত হইতে আছে। গরু ছাগল উঠাইবিনা আইজ?'

ধড়ফড় করে উঠে বসে তাইজ্যা। উদোম পিঠে চাটাইয়ের স্পষ্ট দাগ পড়েছে। দু' হাতের তলা দিয়ে চোখ ঘসে। বিরাট করে হাই তোলে।

'ভাত খাস নাই ক্যান দুপরে?'

সত্যি জ্বর জ্বর ভাব শরীরে। মাথাটা ব্যথা করছে। মনে পড়ে দুপুরে না খেয়ে শুয়ে পড়েছে। পাহাড় সমান অভিমান হয় আতরজানের প্রতি। হাইশ্যাকে তিন বেলা বাড়ির ছোট ছেলে মেয়ে পাঠিয়ে ডেকে নিয়ে খাওয়ায় তারা বিবি। অথচ ওর একটাবার খোঁজও করেনা আত্তি।

মুখ ভার করে বলে, 'আমার জ্বর। হের লাইগা খাই নাই।'

'জ্বর হইবো ক্যান? এখন কি পাট কাটার মওসুম নাকি যে সারা দিন ডুবাইয়া ডুবাইয়া নাইল্যা কাইটা জ্বর বাধাইবি। ওঠ্ ওঠ্ ছোট বিবি ডাকতে আছে।'

'আত্তি? আত্তি ডাকছে আমারে?' হনুমানের মত এক লাফে উঠে দাঁড়ায়। পাশে রাখা গামছাটা তুলে কাঁধের ওপর রাখে। চোখ বড় বড় করে বলে আবার, 'আমারে ডাকতাছে আত্তি?'

'ওই তাইজ্যা, আত্তি কি রে? মাতবরের বিবি না? আত্তি কস ক্যান বেকুব? নানী ডাক মুখে দিয়া আসে না?' ধমক দিয়ে ওঠে মরনির মা।

জোরে জোরে পা ফেলে উঠোন পার হয়ে আতরজানের ঘরের সামনে গিয়ে থামে তাইজ্যা। উৎসাহের মুখে চোখ মুখ ধুতে ভুলে গেছে।

দরজার শালকাঠে তৈরী কপাট জোড়া খোলা। সামনে একটা উঁচু কুর্সিতে বসে আতরজান। সুক্ষ্ম কারুকাজ ভারী চেয়ারের হাতলে। বেঙ্গা মামুদের যুগের চেয়ার। যেমন উঁচু তেমন মজবুত।

পরনে একটা চওড়া কমলা রং পাড় সাদা শাড়ি। কাঁধের ওপর এক রাশ তেলহীন চুল অবিন্যস্তভাবে ছড়ানো। অঙ্গারে পোড়া খাঁটি সোনা যেন লম্বাটে মুখখানা। শুভ্র বসনের নীচে ওর কোমল বদন খানা অপূর্ব সুন্দর আর মোহনীয় মনে হয় তাইজ্যার।

চোখ তুলে অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। মনে মনে বললো জড়িয়ে জড়িয়ে, 'আত্তি' আমার আতরজান। কতো সোন্দর হইয়া গেছস তুই এই কয় মাসে।'

সুতোয় বোনা ঝালরওয়ালা হাত পাখা দিয়ে গায়ে বাতাস করছিলো আতরী। পাখাটা টেনে নেয় মরনির মা। মৃদু হাওয়া করতে থাকে পেছনে দাঁড়িয়ে।

'তাইজ্যা।'

গাঢ় কণ্ঠস্বর। চমকে উঠে চোখ তুলে তাকায়, ঘুমের ঘোর কাটছে তাইজ্যার।

'চাড়াইল্যার দীঘির পাড়ে বাঁশ কাইটা নিয়া একটা ছাপরা উঠাইবি কাইল।'

'ছাপরা? টিনের?'

'না, খেরের। আর তুই থাকবি গিয়া হেই ছাপরায়। পুকুরে এতো জিয়ান মাছ, পাড়ে মাইটা আলুর ক্ষেত, নামায় কাওন আর

চীনা ধান পাকতে আছে। দিন রাইত পাহারা না দিলে চোরে রাখবো কিছু ? এখন থেইকা হেইখানে থাকবি তুই।'

ঠিক কথা। মৃদু মাথা নাড়ে তাইজ্যা।

'আর কে থাকবো আমার লগে ? তুই-তুই-তুমি-তমি যাইবা না।' উৎসাহে তোতলাতে থাকে তাইজ্যা।

গেদু মাতবরের দাদার কালের কুর্সি। এটাতে বসে বেত হাঁকিয়ে মুনি কামলাদের সামাল দিয়েছে মাতবরকুল। চেয়ারটাতে সোজা হয়ে পিঠ খাড়া করে বসে আতরজান। হাতের মুঠোয় আঁচলের চাবির গোছা। অন্যমনস্কভাবে খেলা করতে থাকে চাবি নিয়ে।

বাইরে সোনালু গাছে একটানা ডাকছে একটা 'বউ কথা কও' পাখি। সেদিকে লক্ষ্য নেই। আবার বলে তাইজ্যা, 'একলা থাকুম আমি ? এততো বড় ছাড়া বাড়ি। তেতই গাছে ভুত প্রেত।'

'একলা থাকবি না তো দোকলা পামু কই তোর লাইগা ? তোর লাইগা সাতগাঁর জমিদারের নাতিন আনুম আমি ? কাম নাই কাজ নাই, দিনে তিন বেলা হাতির খোরাক খাও পেট ফাটাইয়া, আর কাচারি ঘরে পইড়া পইড়া হাইঞ্জা তক ঘুমাও। পুরুষ মানুষ নাই বইলা স্বরাজ পাইয়া গেছে গোলামের বাচ্চারা।'

তেজের সঙ্গে উঠে দাঁড়ায় আতরজান। পেছন পেছন হাতপাখা নিয়ে এগোয় মরনির মা। মৃদু দোলাচ্ছে বুড়ি পাখাটা। টুংটুং শব্দ করছে আতরজানের আঁচলে বাঁধা চাবির গোছা।

রাত বাড়ে। ওপরে খাটে শুয়ে আতরজান। নীচে পিড়িতে বসে মাটির হাঁড়িতে তুষের নিভু নিভু আগুনে হাতপা সেকে মরনির মা। আঙ্গুলের মটকা ভাঙতে চেষ্টা করে।

'নানী।'

'কি ? ঘুমাস নাই ছোট বউ ?'

'না। ঘুম আসে না। শরীরটা ম্যাজ ম্যাজ করতে আছে।'

'কেমন কইরা ঘুম আসবো ? এ কাঁচা বদনে একলা ঘুম আসে কারো ? আমি কই কি—'

কাঠি দিয়ে মালসার নিস্তেজ আগুন উসকে দেয় বুড়ি। গুঁজো পিঠ টানটান করে বলে, 'আরেকটা বিয়া কর নাতিন। মাতবরের কাছে জমিজমা সয় সম্পত্তি ছাড়া তো পাস নাই কিছু। সোনার শরীরটা পুইড়া ছাই হইয়া গেলো না তোর? একটা যোয়ান সাবাস মর্দ দেইখা—'

'হ নানী, বিয়া করুম। ইদ্দত তো শেষ। রাজী হইয়া যামু হেরা আইলে আবার।'

'কে? কারা আইবো?'

'মাতবরের চল্লিশা খাইতে আইছিলোনা জমির সিকদারের চাচা তালেব সিকদার? আমার লগে দেখা করছে জেয়াফত খাইয়া। কইছে আমি যদি রাজী থাকি—।'

'কি কইছে? নতুন চরের জমিজমার লাইগা জমির সিকদার তোরে নিকা করতে চায়? এক আটকুইরা হারামী মরছে, আরেক বুড়ারে সাঙ্গা করবি তুই? সব্বনাশ।'

'নানী।' কাত হয়ে শুয়ে ছিলো আতরজান। উঠে বসে হারিকেন বাতি উসকে দেয়, 'জমির সিকদার না নানী, হেই মড়াটারে কেটা কবুল করে? এতোটা বচ্ছর গেদু মাতবরের ঘর কইরা আক্কেল বুদ্ধি খুলছেনা আমার? দুনিয়ার আওভাও শিখছিনা কিছু?'

'তয়?'

'জমির সিকদারের পুত আলতাফ সিকদার নানী। ভোটে লেম্বর হইছে। গেরাম সরকার এখন আলতাফ সিকদার। পাল্কিতে চইড়া হাটে যায়। হাঁইটা গেলে মাথায় ছাত্তি ধরে পাইক পেয়াদা। দশ কেলাস তক পড়ছে। এ-লে বি-লে পাশ।'

উঠে পিঠ খাড়া করে বসে পানদান থেকে একটা খিলি তুলে নেয়। এক ঢোক পিক গিলতে গিলতে বলে, 'তোমার কথা ঠিক নানী। তালেব্যা সিকদার বজ্জাত কম না। পেরথমে পরস্তাব দিছিলো জমির সিকদারের লাইগা। আমি কইলাম, ধ্যেৎ, হেই গুজা চক্ষে ছানিওয়ালা বুইড়ারে কেডা কবুল করে? বুইড়ার এক ঠ্যাং তো কবরে। তখন কান চুলকাইয়া কয় তালেব মিয়া ভাইবা চিন্তিয়া, তয় আলতাফ মিয়ারে পছন্দ হইবো তোমার? জোয়ান পোলা, সিকদার বাড়ির বড় পুত।'

জর্দাওয়ালা পানের ঘন পিক গেলে আতরজান, 'নতুন চরের—চর আতরজানের উপর নজর হে গো নানী। কম সে কম তিন হাজার মণ

ধান পামু এই খোন্দে। বোঝনা চালটা হে গো? আমারে পুতের বউ কইরা যদি—'

ঘরের ভেতর উঁচু খড়মের শব্দ তুলে পায়চারি করতে থাকে আতরী, 'চালটা আমারো কম না নানী। আলতাফ সিকদার থন দশটা পুত পেটে ধরুম। একটা পোলা থাকবো গেদু মাতবরের ভিটাতে—আমার এই আটচালা ঘরে, দুইটা চাড়াইল্যার পুকুর পাড়ে আর বাকীগুলা চরের আর জামির সিকদারের তালুকের মালিক হইবো কালে কালে।'

বলতে বলতে মোটা জাজিম পাতা খাটের ওপর উঠে বসে আতরজান। পা জোড়া এগিয়ে দেয় মরনির মা'র মুখের কাছে, 'জোরে জোরে টিপা দেও দেখি নানী। সোন্দর কইরা টিপা দিলে ঘুম আইসা যাইবো। রাইতটা একলা বড় খালি খালি লাগে। এমনে এমনে ঘুম আসতে চায়না চক্ষে।'

—০—